শরৎচন্দ্রের অবিনশ্বর রচনা
শ্রীকান্ত (৩য় ও ৪র্থ পর্ব) অবলম্বনে রচিত

রাজলক্ষ্মী

(নাটিকা)

নাট্যরূপ
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : কলিকাতা-

প্রকাশক :
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৫

মূল্য : দুই টাকা

মুদ্রক :
শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৩৪-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১৩

রাজলক্ষ্মী

ষ্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ

প্রথম অভিনয়—১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ (২রা জুন, ১৯৫৮)

চরিত্র

পুরুষ

শ্রীকান্ত
বজ্রানন্দ
যদুনাথ তর্কালঙ্কার
প্রসন্নঠাকুর্দা
কাশীরাম কুশারী
গহর
দ্বারিকদাস বাবাজী
রতন
নবীন
কালীদাস মুখুজ্জে
কালীদাস মুখুজ্জের প্রতিবেশীগণ
মধুডোম
মধুডোমের সম্বন্ধী
মধুডোমের প্রতিবেশীগণ
শিবু পণ্ডিত
শিবু পণ্ডিতের সম্বন্ধী
নয়নচাঁদ চক্রবর্ত্তী
মন্মথ
ন্যায়রত্ন
রাখাল পণ্ডিত
অজয়
বিজয়
বিনু
বৈষ্ণবগণ ও গ্রামবাসীগণ
মহারাজ
মেসের চাকর

স্ত্রী

রাজলক্ষ্মী
সুনন্দা
কমললতা
কুশারী গৃহিণী
রাঙাদিদি
পুঁটুরাণী
মধুডোমের স্ত্রী
মধুডোমের কন্যা
কানাই বসাকের স্ত্রী
সরস্বতী
দুর্গা
লক্ষ্মী
পদ্মা
ও বৈষ্ণবীগণ

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—

শ্রীকান্ত—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

রতন—তুলসী চক্রবর্ত্তী

বজ্রানন্দ—অনুপকুমার

কাশীরাম কুশারী—চন্দ্রশেখর

যদুনাথ তর্কালঙ্কার—অতনু ঘোষ

মধু ডোম—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

শিবু পণ্ডিত—শ্যাম লাহা

রাখাল পণ্ডিত—রবীন ভট্টাচার্য (হরবোলা)

মধু ডোমের সম্বন্ধী—অরুণ রায়

বিজয়—সুকান্ত গোস্বামী

অজয়—শান্তিগোপাল

বিনু—শ্রীমান স্বপনকুমার

প্রসন্ন ঠাকুর্দ্দা—জহর গাঙ্গুলী

দ্বারিকদাস বাবাজী—শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

গহর—প্রশান্তকুমার

মেসের চাকর—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

কালীদাস মুখুজ্যে—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

নয়নচাঁদ চক্রবর্ত্তী—প্রীতি মজুমদার

নবীন—শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত

মন্মথ—প্রমাংশু বোস

মহারাজ—শান্তি দাশগুপ্ত

শিবু পণ্ডিতের সম্বন্ধী—শৈলেন ভট্টাচার্য্য

অন্যান্য ভূমিকায়—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গোপাল দে, বিষ্ণু সেন, রামকৃষ্ণ বসু, অজয় সিংহ (এ্যাঃ), বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, কানাই চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়, (জং), মণি মজুমদার (এ্যাঃ), মণি শেঠ (এ্যাঃ), নকুল দত্ত, পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, শোভেন চট্টোপাধ্যায়, তুলসী ঘোষ, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সাহা, বিদ্যুৎ গোস্বামী, শ্রীমান সমীর দে, কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, কার্ত্তিক মিত্র, পতাকী মুখোপাধ্যায়।

রাজলক্ষ্মী—শিপ্রা দেবী

কুশারী গৃহিণী—অপর্ণা দেবী

সুনন্দা—গীতা দে

কমললতা—মিতা চট্টোপাধ্যায়

কানাই বসাকের স্ত্রী—শৈলবালা

পুঁটুরাণী—মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মী—গীতা দেবী

সরস্বতী—গীতশ্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়

পদ্মা—সূর্য্য মিত্র

দুর্গা—কল্যাণী দাস, বি. এ

রাঙাদিদি—বেলারাণী

অন্যান্য ভূমিকায়—ভারতী, বীণা, সবিতা

পরিশিষ্ট

সংগঠনে ঃ

প্রযোজনা	ঃ	শ্রীসলিল কুমার মিত্র
পবিচালনা	ঃ	শ্রীশিশিব মল্লিক
নাট্যরূপ	ঃ	শ্রীদেবনাবায়ণ গুপ্ত
গীতিকার	ঃ	শ্রীশৈলেন রায়
সুরকার	ঃ	শ্রীমানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী	ঃ	শ্রীমণীন্দ্র দাস (নান্টুবাবু)
মঞ্চাধ্যক্ষ	ঃ	শ্রীঅনিল বসু
স্মাবক	ঃ	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্য সবকাব

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু,
শ্রীমুরারী রায়চৌধুরী, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
শ্রীমাখন মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি

আলোক-সম্পাতকারী

শ্রীঅজিত সাহা, শ্রীবেজপৎ সিং, শ্রীভানু মুখার্জ্জী, শ্রীবৈদ্যনাথ সেন,
শ্রীজলধর নান, শ্রীকানাইলাল ধর, শ্রীমণীন্দ্রনাথ দে, ও
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ

মঞ্চ-সজ্জাকর

শ্রীঅনিল কুমার দাস, শ্রীভগীরথ মিস্ত্রী, শ্রীভূষণ সামন্ত, শ্রীবিজয় চিত্রকর,
শ্রীযুগল কুমার গুঁই, শ্রীকার্ত্তিক কর্ম্মকার, শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস,
শ্রীবলাই অধিকারী, শ্রীরামদাস দাস, শ্রীশশীভূষণ দাস,
শ্রীসন্তোষ সরকার ও শ্রীসুকুমার দে

শব্দ-প্রক্ষেপণ —শ্রীদুলাল মল্লিক ও শ্রীঅজিত মৈত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সাঁইথিয়া রেল স্টেশনের পশ্চাদ্‌ভাগ। একটী গাছতলায় বহু মোট-মাটারী জড় করা আছে। উহাদের মধ্যে গৃহস্থালী আসবাবপত্রের অভাব নাই। শ্রীকান্ত একটী বাক্সের উপর উপবিষ্ট; পার্শ্বে রতন, তাহার চোখমুখ বিরক্তিপূর্ণ। তাহারই অদূরে মহারাজ দাঁড়াইয়াছিল। রতন মহারাজকে বলিল]

রতন। যাও মহারাজ! জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করে গাড়ীতে তুলে নাও গে।

[মহারাজ চলিয়া গেল।]

শ্রীকান্ত। রতন, এখান থেকে গঙ্গামাটি কতদূর?

রতন। এই সাঁইথিয়া স্টেশন থেকে ১০।১২ ক্রোশ গোরুর গাড়ী করে যেতে হয়।

[ইতিমধ্যে গাড়োয়ানেরা মালপত্র লইয়া যাইতে লাগিল।]

শ্রীকান্ত। এর আগে তোমরা গঙ্গামাটি গেছো?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি একবার গেছি, তবে মা কখনো যাননি। গঙ্গামাটির পত্তনি যখন নেওয়া হয় তখন মোক্তারজী কিষণলালের সঙ্গে এসে আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। জানেন বাবু, গাঁয়ে এক-ঘরও লেখাপড়া-জানা লোক নেই—যত সব চাষাভূষোর বাস। অমন সোনার জায়গা ছেড়ে মা যে কেন এ-দেশে এলেন তা তিনিই জানেন।

শ্রীকান্ত। আমার অসুখের জন্যই তোমার মাকে এখানে আসতে হ'লো রতন। দেখলে না, পাটনার ডাক্তারেরা সবাই বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা বলতে লাগলেন, তাই—

রতন। অসুখ কি আর কারো হয় না বাবু! হাওয়া খাওয়ার জন্যে সবাই কি আর গঙ্গামাটিতে আসে? জানেন বাবু, এখানে এসে থাকার জন্যে মাটির ঘর তুলতে ওঁব গোমস্তা কাশীরামকে কিছুদিন আগে দু'হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীকান্ত। তাই না-কি?

রতন। আঁজ্ঞে হাঁ। সেই দু'হাজার টাকায় যে কত ভাল ভাল জায়গায় যাওয়া যেতো বাবু!

শ্রীকান্ত। তা যা বলেচ!

[ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী স্নান সারিয়া ভিজা চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধিয়া, তাহার উপর ঘোমটা টানিয়া প্রবেশ করিল।]

রাজলক্ষ্মী। নেয়ে এলাম, এবার তোমায় কিছু খেতে দিই। মোট-ঘাটগুলো গাড়োয়ানেরা তো প্রায় গাড়ীতে তুলেই ফেলেচে দেখে এলাম। তোমার গাড়ীতে বিছানা পাততে ওদের বলে এসেচি, খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ো। গাড়ী ছেড়ে দিক।

শ্রীকান্ত। বেশ তো, দাও কি খেতে দেবে।

[রাজলক্ষ্মী একটী আসন পাতিয়া, কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া জলের গ্লাস দিল এবং কলাপাতায় খাবার গুছাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার সম্মুখে একজন ২০৷২১ বৎসরের সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; সন্ন্যাসীর নাম বজ্রানন্দ।]

বজ্রানন্দ। নারায়ণ!

[রাজলক্ষ্মী বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া]

রাজ। আসুন।

[পরে অপর একটি আসন পাতিয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া]

আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি। আপনাকে হাত-মুখ ধোবার জল দিক। ওরে রতন! তুই বাবা চিড়ে-দুধের যোগাড় দেখ্।

[রতনের প্রস্থান।]

বজ্র। কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রযোজনে এসেচি।

রাজ। আচ্ছা আপনি খেতে তো বসুন, সে পরে হবে'খন। বাড়ী ফেরবার টিকিট চাই তো? সে আমি কিনে দেব।

বজ্র। না না, আমি টিকিটের জন্যে আসিনি আপনার কাছে। আমি খবর নিয়েচি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একটা ভারী বাক্স আছে, সেটা যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়ীতে তুলে নেন—

রাজ। আপনি গঙ্গামাটি যাবেন না-কি?

বজ্র। না, গঙ্গামাটি নয়, তবে ওরই কাছাকাছি।

রাজ। ও! তা আপনার বাক্সটা না হয় নিলাম, কিন্তু আপনি নিজে যাবেন কি করে?

বজ্র। আমি গাড়ীর সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারব।

রাজ। আপনার বাক্সতে আছে কি?

বজ্র। গোটাকতক বই, আর ওষুধপত্তর।

রাজ। ওষুধ! আপনি কি ডাক্তার না-কি?

বজ্র। না, আমি সন্ন্যাসী। আপনাদের গঙ্গামাটির দিকে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে, শোনেননি?

রাজ। কই না তো! তা যাক, আহারে বসুন।

[ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মীর খাবার দেওয়া শেষ হইল, কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া গ্লাসে জল দিল।]

শ্রীকান্ত। নিন, বসুন।

[লুচি ও তরকারী-সহযোগে দুইজনে আহারে প্রবৃত্ত হইল।]

রাজ। সাধুজী! আপনার নামটী কি?

বজ্র। বজ্রানন্দ।

রাজ। বাপ্‌রে বাপ্‌! ডাক-নামটী?

বজ্র। সে-নামের সঙ্গে আর তো কোনো সম্বন্ধ নেই; নিজেরও না, পরেরও না।

রাজ। সে-কথা সত্যি। আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ী থেকে পালিয়েচেন কতদিন?

[শ্রীকান্ত গম্ভীরভাবে রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিল। দেখা গেল রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।]

বজ্র। আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজ। তা সত্যি। তবে কি জানেন, একবার এই সন্ন্যাসী নিয়ে আমায় ভারী ভুগতে হয়েছিল। (শ্রীকান্তের প্রতি) হ্যাঁ-গা, বল তো তোমার সেই সন্ন্যাসী হওয়ার গল্পটা।

[সহসা বজ্রানন্দ হাসিতে গিয়া বিষম খাইল।]

রাজ। আহা, ষাট্! কে বুঝি বাড়ীতে নাম করচে!

বজ্র। (শ্রীকান্তের প্রতি) আপনি বুঝি তা হলে একবার সন্ন্যাসী—

শ্রীকান্ত। (লুচি গিলিতে গিলিতে) উঁহুঁ, একবার নয়, একবার নয়—

বজ্র। ফিরলেন কেন?

শ্রীকান্ত। (রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া) ঐ যে, ওঁর জন্যে—

রাজ। হুঁ—তাই বৈ-কি! ব্যাপার কি জানেন, ভয়ানক অসুখে পড়ে—

শ্রীকান্ত। অসুখ তো বটেই, তা ছাড়া মশার কামড় চামড়ায় সইলো না। তা যাক, আচ্ছা আপনাকে আমি—

বজ্র। (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নাম কি?

রাজ। ওঁর নামে কি হবে? উনি বয়সে বড়, ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকে বৌদি বলে ডাকলে রাগ করবো না।

বজ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখুন, বলতে আমার কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আমাদের মানে সন্ন্যাসীদের ও-সব বলে ডাকতে নেই।

রাজ। নেই কেন? দাদার বৌকে সন্ন্যাসীরা কিছু মাসী বলেও ডাকে না, আর পিসী বলেও ডাকে না। ও-ছাড়া তুমি আমাকে আর কি বলে ডাকবে শুনি?

বজ্র। (সলজ্জভাবে) আচ্ছা বেশ। ছ'সাত ঘণ্টা আছি আপনাদের সঙ্গে, এর মধ্য যদি দরকার হয় তো তাই বলেই ডাকবো।

রাজ। তা হলে ডাকো না একবার।

বজ্র। এখন ডাকবো কেন? দরকার হলে ডাকবো বলেচি।

[ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী পাতে গোটা-কয়েক সন্দেশ দিল।]

রাজ। বেশ, তা হলেই আমার হবে। কিন্তু নিজের দরকারে তোমাকে যে কি বলে ডাকবো ভেবেই পাচ্ছি না। (শ্রীকান্তকে দেখাইয়া) ওঁকে তো ডাকতুম সন্ন্যাসীঠাকুর বলে। সে আর হয় না, গুলিয়ে যাবে। তোমাকে না হয় ডাকবো—সাধু-ঠাকুরপো বলে, কি বল?

বজ্র। বেশ তাই ভালো।

রাজ। (শ্রীকান্তের প্রতি) তুমি রোগামানুষ উঠে পড়, আমাদের সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তাই যাই।

[উঠিয়া যাইবার সময় একবার বজ্রানন্দের পাতের দিকে ও একবার হাঁড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বজ্রানন্দের তাহা চক্ষু এড়াইল না।]

বজ্র। (লজ্জিতভাবে) এ কি! আমি একাই যে সব শেষ করে ফেললাম—হাঁড়িতে যে আর কিছুই রইলো না!

[ইতিমধ্যে রতন প্রবেশ করিয়া জানাইল]

রতন। মা, চিড়ে তো ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ-দই আপনার জন্যে পাওয়া গেল না।

বজ্র। (অপ্রতিভভাবে) ছি-ছি, দেখুন দেখি, আপনাদের আতিথ্যের ওপর কি ভয়ানক অত্যাচার করলুম! (উঠিবার উপক্রম করিল)

[রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিল]

রাজ। আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো, যদি ওঠো। সত্যি বলচি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেবো।

বজ্র। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না। কিন্তু আপনারও তো কিছু খাওয়া চাই। মাথা খেয়ে তো আর সত্যি সত্যি পেট ভরবে না।

রাজ। ছি-ছি, অমন কথা মেয়েমানুষকে বলতে নেই ভাই। আমি ও-সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না।

শ্রীকান্ত। যাক, এখন তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়ার ব্যবস্থা করা যাক,—সন্ধ্যেও হয়ে এলো বলে।

রাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরী করা ঠিক হবে না। ওরে রতন! তুই আর মহারাজ খেয়ে নিগে যা।

রতন। আচ্ছা মা।

[রতনের প্রস্থান।]

শ্রীকান্ত। অসুখের পর খেয়ে আর দাঁড়াতে পারিনে, গাড়ীতে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি গে। তা তুমিই বা একা হেঁটে যাবে কেন ভায়া? আজকের মত না হয় আমার গাড়ীতেই চল, দিব্যি কথা কইতে কইতে যাওয়া যাবে।

বজ্র। সঙ্গেই তো রইলেন। না পারলে না হয় আপনার গাড়ীতে উঠেই বসবো।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা, আমি তা হলে ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করি গে, কেমন ?

বজ্র। আসুন।

[শ্রীকান্তের প্রস্থান।]

রাজ। তুমি যেখানে যাচ্ছ, রাত্তির বেলা সেখানকার পথ কি খুঁজে পাবে ?

বজ্র। গ্রামটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।

রাজ। সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায় ?

বজ্র। থাকার জন্যে ভাবনা কি ? গাছতলা নিশ্চয়ই একটা পাওয়া যাবে।

রাজ। সে কি! এই শীতের রাতে গাছতলায় সামান্য একটা কম্বল অবলম্বন করে ? না না, সে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না ঠাকুরপো।

বজ্র। কিন্তু আমাদের তো ঘর-বাড়ী নেই, আমরা তো গাছতলাতেই থাকি দিদি।

রাজ। কিন্তু সে দিদির চোখের সামনে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাইনে। রতন! ও রতন!

[ব্যস্ত-সমস্তভাবে চিড়ে-মুড়কী খাইতে খাইতে রতনের প্রবেশ।]

রাজ। দেখ্, রতন, আমাকে জিজ্ঞেসা না করে মাঝপথে গাড়ী থেকে যেন কারুর কোন জিনিস নামানো না হয়।

বজ্র। (হাসিয়া) ভয় নেই দিদি। আর যাই করি, চুপি চুপি চোরের মত আপনার স্নেহের বন্ধন কেটে পালাতে পারবো না। চলুন।

রাজ। রতন, ওদের ডেকে বল্, বাকী জিনিসগুলো গাড়ীতে তুলে দিক।

[রাজলক্ষ্মী ও বজ্রানন্দ গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল, রতন গাড়োয়ানদের ডাকিল]

রতন। এই, এদিকে এসো—

[গাড়োযনেরা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গঙ্গামাটি। রাজলক্ষ্মীর গৃহের বহির্ভাগ। অন্ধকার মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ পাখীর ডাক শোনা গেল। প্রভাতের সূচনা করিয়া বার-কয়েক মোরগ ডাকিয়া উঠিল। নেপথ্যে দূর হইতে গাড়োয়ানের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—]

—গাড়োয়ানের গান—

চল্ রাহী চল্ প্রেম-নগরে
মন-পবনে চল্,
সেথা তোমায় নিয়া সুজন বন্ধু
বাঁধবো প্রেমের ঘর।
(বন্ধু) বাঁধবো সাধের ঘর।
পীরিতি নগরের হাটে মনের বেচা-কেনা,
সেথা প্রাণ দিয়ে হে প্রাণের বন্ধু
শুধবো প্রেমের দেনা,
সেথায় ফুলের মত মন মেলিব—
(তুমি) বসিবে ভ্রমর।
চল্ রাহী চল্ রতনপুরে।

(গীতিকার—শৈলেন রায়)

[মঞ্চের আলো ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেখা গেল, দুদিকে কয়েকটি পর পর নূতন মাটির ঘর, মধ্যস্থলে প্রশস্ত উঠান, উঠানের মধ্যে কয়েকটি ফুলগাছ। একপাশে একটি তুলসীমঞ্চ। সর্ব্বত্রই একটি পরিচ্ছন্ন ভাব সুপরিস্ফুট।]

[ব্যস্তভাবে বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। অজয়! এসে গিয়েচে রে, এসে গিয়েচে।

[অজয়ের প্রবেশ]

অজয়। এসেচেন? কৈ?

বিজয়। ঐ যে।

অজয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো,—গাঁ এবার জাঁকিয়ে উঠবে।

বিজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠবে বৈ-কি। গঙ্গামাটি এবার সত্যিই জাঁকিয়ে উঠবে। ওরে অজয়, আয় আয়, কুশারীমশাইকে খবরটা দিই গে —ওঁরা এসে পৌঁছলেন বলে—

[ব্যস্তভাবে অজয় ও বিজয়ের প্রস্থান।]

[দূর হইতে গোরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ ও খুরের শব্দ ভাসিয়া আসিল। মধ্যে মধ্যে গাড়োয়ানদের গোরু খেদাইবার মুখের শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের আলোচনার সহিত গোরুর গাড়ী আসার ইঙ্গিত নিকটতর হইতে থাকিল। গাড়োয়ানেরা চুম্‌কুড়ি দিয়া গোরুর গাড়ী থামাইবার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য হইতে রতনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

রতন। (নেপথ্যে) আ মর্! চোখে কি কখনো মানুষ দেখিস্‌নি? সরে যা, সরে যা বলচি! আ ম'লো, গায়ের ওপর এসে পড়ে! যেন রথ-দোল দেখতে এসেচে! যত সব অসভ্য জানোয়ারের দল!

এখুনি ছোঁয়াছুঁয়ি করে সব একাকার করে দেখচি! দেখচেন বাবু, ছোটলোক বেটাদের আস্পর্দ্ধা! বেরো—বেরো বলচি।

[একদল গ্রাম্য লোককে তাড়া করিয়া রতন মঞ্চে প্রবেশ করিল। রতনের মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রামবাসীরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোটা হাতে বজ্রানন্দ প্রবেশ করিল এবং জনৈক অল্পবয়স্ক গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহার হাতে ঘটি দিয়া বলিল]

বজ্র। ওহে, শোনো শোনো। কাছাকাছি কারু গোরু থাকে তো একটু দুধ এনে দাও তো।

[ঘটি লইয়া গ্রাম্য ব্যক্তির প্রস্থান।]

গাঁয়ের টাটকা খাঁটি জিনিস, চায়ের রঙটা যা দাঁড়াবে দিদি।

[রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং রতন ও বজ্রানন্দের সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। গাড়োয়ানেরা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মালপত্রগুলি দাওয়ায় নামাইয়া রাখিতেছিল—তৈজসপত্র পূর্ব্বেই নামানো হইয়াছিল। বজ্রানন্দের চায়ের ব্যবস্থায় সায় না দিয়া রাজলক্ষ্মী একটি ঘটির দিকে লক্ষ্য করিয়া রতনকে বলিল]

রাজলক্ষ্মী। ওরে রতন, যা তো বাবা, ঐ ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয় তো।

[রতন বিরক্তভাবে দাওয়া হইতে ঘটিটী লইয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে জনৈক গ্রাম্য বালকের হাতে লাগিয়া ঘটিটী ছোঁয়া গেল। রতন ছেলেটিকে প্রচণ্ড ধমক দিয়া বলিল]

রতন। নচ্ছার, পাজী বেটা! তুই ঘটি ছুঁলি কেন? চল্ ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি। চল্, চল্ বলচি।

[রতন একপ্রকার জোর করিয়া ছেলেটীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।]

রাজ। (বিরক্তভাবে) গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই চা চাই?

বজ্র। গৃহীদের রাত পোহাবে না বলে বুঝি আমাদেরও রাত পোহাবে না? কি বলেন দাদা?

শ্রীকান্ত। (হাসিয়া) তা তো বটেই।

বজ্র। চলুন দাদা, বাড়ীটার ভেতর ঢুকে দেখা যাক কাঠ-কুঠো উন্মুন আছে কি-না?

[শ্রীকান্ত ও বজ্রানন্দ উঠান হইতে ঘরের দিকে চলিয়া যাইতে যাইবে, ইতিমধ্যে অপরদিক দিয়া রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কাশীরাম কুশারী মহাশয় হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে তিন-চারজন লোক, কাহারও মাথায় ঝুড়িভরা শাকসব্জী ও তরি-তরকারী, কাহারও হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারও হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারও হাতে একটা বৃহৎ রোহিত মৎস্য। কুশারী মহাশয়ের বয়স ষাটের উপর, রঙ ফর্সা। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল]

রাজ। এই যে আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

[গলবস্ত্র হইয়া কুশারীমহাশয়কে প্রণাম করিল। কুশারী-মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন]

কুশারী। মঙ্গল হোক। (দধি, মৎস্য প্রভৃতি দেখাইয়া) এই-সব যোগাড় করে আনতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল মা।

রাজ। তা হোক, ওর জন্যে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়নি।

[ইতিমধ্যে রতন একঘটি জল আনিয়া দাওয়ায় রাখিল।]

বজ্র। আর সব অসুবিধা আপনি দূর করেচেন এই সব জিনিসপত্র এনে। বাঃ-বাঃ সব জিনিসই একেবারে টাটকা! (শ্রীকান্তের প্রতি) দাদা, মাছটা দেখেচেন? শহরে যত টাকাই ফেলুন না কেন, অমন টাটকা মাছ কিন্তু মিলবে না।

শ্রীকান্ত। তা তো বটেই।

কুশারী। (সবিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর প্রতি) ইনি?

রাজ। সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমশাই, ওটি আমার ভাই—সাঁইথিয়া স্টেশনের কাছে ওর সঙ্গে দেখা। আর বলেন কেন, বার বার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেচে।

বজ্র। এবার কিন্তু ও-কাজটা অত সহজে হবে না দিদি।

রাজ। আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন।

[ইতিমধ্যে জলের ঘটি লইয়া রতন প্রবেশ করিল।]

মহারাজ, কাঠের উনুন জেলে তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করে দাও।

মহারাজ। তা হলে, এ-বেলা কি রান্না হবে মা?

রাজ। এদিকের তরিতরকারী ভাত ডাল যা হয় রান্নার তুমি ব্যবস্থা কর। অমন টাটকা মাছের মুড়ো তোমাকে আমি রাঁধতে দিচ্ছি না, আমি গিয়ে ওটা নিজেই ব্যবস্থা করচি।

[মহারাজ, রাজলক্ষ্মী ও জনৈক ভৃত্য আনাজ তরিতরকারীগুলি লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে যে লোকটীকে বজ্রানন্দ দুধ আনিতে দিয়াছিল, সে দুধ লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বজ্রানন্দ কহিল]

বজ্র। কি এনেচো—দুধ? ওখানে রেখে যাও।

[লোকটি দুধের ঘটি রাখিয়া চলিয়া গেল। কুশারী বলিলেন]

কুশারী। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি আবার ওবেলার দিকে আসবো।

[কুশারীমহাশয়ের প্রস্থান।]

বজ্র। রতন! দুধটুকু ঘরেই রেখে এসো।

[রতন দুধের ঘটি লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।]

বজ্র। (শ্রীকান্তের প্রতি) দাদা, যে ছলেই হোক, ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েচেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ-বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবিনে। তবে কি জানেন, চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভার নেওয়া ভাল,—তাতে জমিদারী করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্‌কা হয়।

[ইতিমধ্যে একটী থালার উপর তিন কাপ চা লইয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল।]

বজ্র। এই যে, চা হয়ে গেছে দেখচি। বেশ—বেশ—দিন।

[রাজলক্ষ্মী এক কাপ বজ্রানন্দের হাতে, অন্য কাপ শ্রীকান্তর হাতে দিয়া বলিল]

রাজ। কুশারীমশাই?

শ্রীকান্ত। তিনি চলে গেছেন।

বজ্র। ও—আপনি চায়ের কথা ভাবচেন তো? ওর জন্যে ভাবনা নেই দিদি। আমি থাকতে কোন জিনিসেরই আপনার অপচয় হবে না, দিন।

[স্বহস্তে অপর কাপটি থালা হইতে তুলিয়া লইয়া নিজের পাশে রাখিল।]

যাই বলুন দিদি, সম্পত্তিটী আপনার ভালো, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজ। ছেড়ে যেতে তোমাকে তো আমরা সাধচি না ভাই—

বজ্র। সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি, ঠকবেন। দিদি, আপনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা ততক্ষণ গ্রামখানা দেখে আসি। আসুন দাদা।

[শ্রীকান্ত ও বজ্রানন্দের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

[কুশারীমশাইএর বাড়ীর উঠান। মধ্যাহ্নকাল। সুনন্দা স্নান সারিয়া শুদ্ধবস্ত্রে রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, কুশারীগৃহিণী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য ঘরে ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় কানাই বসাকের বিধবা স্ত্রী তাহার নাবালক পুত্রের হাত ধরিয়া কুশারীগৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুশারীগৃহিণী তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া গেলেন, বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। তুই আবার এসেচিস্ বসাক-বৌ? যা যা, এখন যা— খাওয়া-দাওয়ার সময়। অন্য সময়ে আসিস্।

[সুনন্দা ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

বসাক-বৌ। না এসে কি করি বড়-মা। আমার যে এদিকে চলে না।

কুশারীগৃহিণী। তা আমরা কি করব?

বসাক-বৌ। তোমরাই পারো বড়-মা, আমাদের দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। ছেলেটাকে নিয়ে আমারা এ ক'মাস যে কি কষ্টে যাচ্ছে, সে আর কি বলব। ক্ষিদের জ্বালায় ছেলেটা কাঁদে, পেট-ভরে দুটো খেতেও দিতে পারি না।

কুশারীগৃহিণী। তোদের কষ্ট তা তো বুঝচি। কিন্তু নিজের নিলামে কেনা বিষয় কেউ কি কাউকে ফিরিয়ে দেয় বসাক-বৌ?

বসাক-বৌ। বিষয়টা যদি বড়বাবু সত্যিই কিনে নিতেন, তা হলে না খেয়ে মরে গেলেও তোমাদের দরজায় এমন করে ছেলের হাত ধরে আসতাম না বড়-মা।

কুশারীগৃহিণী। কিনে নেননি? তা হলে তুই বলতে চাস্ বিষয়টা উনি ফাঁকি দিয়ে নিয়েচেন?

বসাক-বৌ। তোমরা বেরাহ্মণ, আমাদের পুরুত। অমন ছোট কথা মুখে আনতে পারব না। কিন্তু নিলামে যে বড়বাবু আমার বিষয়টা কিনে নিলেন, আমি একবার জানতেও পারলাম না?

কুশারীগৃহিণী। তুই জানবি কি করে? তোর স্বামী যেমন বিষয়-সম্পত্তি দেখার ভার ওঁর ওপরে দিয়ে গিয়েছিল, তেমনি সেইসঙ্গে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল যে!

বসাক-বৌ। দেনা রেখে গিয়েছিল? আমি গরীব। এখন দেনা দেখিয়ে বিষয়টা নিয়ে নেবার মতলবে আছ? বেশ! ভগবান এর বিচার করবেন, ভগবান এর বিচার করবেন। আমি ছেলে নিয়ে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমাদের দরজায় আর আসব না—আর আসব না।

[কানাই বসাকের স্ত্রী ছেলের হাত ধরিয়া দুঃখিত মনে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। সুনন্দা এতক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। তাহারা চলিয়া গেলে, কুশারীগৃহিণী সুনন্দার মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। কাছে আসিয়া সস্নেহে বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। এ কি সুনন্দা! অমন করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? শরীর ভাল আছে ত?

সুনন্দা। হ্যাঁ।

কুশারীগৃহিণী। তবে আর সময় নষ্ট করিস্‌নে ভাই। ভাতের ফেনটা গেলে ফেল্‌ গে যা। তোর ভাসুরের খাওয়ার সময় হয়ে এলো।

[সুনন্দা দাঁড়াইয়াই রহিল। বড়-জায়ের কথার কোন জবাব দিল না, এমন কি রান্নাঘরের দিকে যাইবারও তাহার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। কুশারীগৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। কি রে? তবুও দাঁড়িয়ে রইলি যে! কি হয়েচে সুনন্দা?

সুনন্দা। না কিছু হয়নি। কানাই বসাকের বৌ যা বলে গেল, সে-কথা সত্যি কি-না, না জেনে আমি আর রান্নাঘরে ঢুকবো না দিদি।

কুশারীগৃহিণী। সে আবার কি কথা?

সুনন্দা। ঠিকই বলচি দিদি। আমি জানতে চাই, কানাই বসাকের বৌকে তার স্বামীর সম্পত্তি তোমরা ফিরিয়ে দিচ্ছ না কেন?

কুশারীগৃহিণী। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কি সুনন্দা?

সুনন্দা। দরকার আছে দিদি। আমি জানতে চাই, তোমরা তার স্বামীর বিষয় তাকে ফিরিয়ে দেবে কি না?

কুশারীগৃহিণী। ফিরিয়ে দেবার মালিক আমি নই।

সুনন্দা। তা হয়তো নও, কিন্তু যিনি মালিক তাঁকেও তো কথাটা বুঝিয়ে বলতে পার।

কুশারীগৃহিণী। বিষয়-সম্পত্তির কথায় আমি থাকতে পারব না সুনন্দা।

সুনন্দা। ও! তা হলে তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্ব্বস্ব বঞ্চিত করে সারা-জীবন পথের ভিখিরী করে রাখবে?

কুশারীগৃহিণী। যা জানিস্‌নে সুনন্দা, তা নিয়ে কথা বলিস্‌নে। কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেলে, তোর বড়ঠাকুর তা কিনে নিয়েচেন।

সুনন্দা। (আশ্চর্য্যভাবে) কিনে নিয়েচেন ?

কুশারীগৃহিণী। হ্যাঁ। নিজের কেনা বিষয় কেউ কি পরকে ছেড়ে দেয় ছোট-বৌ ?

সুনন্দা। কিন্তু বড়ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায় ?

কুশারীগৃহিণী। (বিরক্তভাবে) তা আমি কি জানি ? সে কথা জিজ্ঞেসা কর্‌গে যা তোর বড়ঠাকুরকে।

সুনন্দা। আমি কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে চাই না দিদি। একজন অনাথা বিধবা আর তার নাবালক ছেলেটার মুখ চেয়েই বলচি, ও-বিষয় বড়ঠাকুরকে তুমি ফিরিয়ে দিতে ব'লো।

কুশারীগৃহিণী। ও-সব কথা আমি বলতে পারব না। ইচ্ছে হয় তুই নিজে বলিস্। আচ্ছা সুনন্দা, তুই কি ওই বজ্জাত বেটির ছেঁড়া কথা নিয়ে সময় কাটাবি ? কর্ত্তা এখনই এসে পড়বেন। ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার ক্ষেত দেখতে গেছেন, তারও ফিরতে দেরী নেই। বিজয় নাইতে গেছে, এখনি এসে ঠাকুর-পূজোয় বসবে। যা, ও ছেঁড়া কথা ছেড়ে রান্নাঘরে যা।

সুনন্দা। না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয় সে বিষয় যদি তোমরা ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আর আমি রান্নাঘরে ঢুকবো না। ঐ নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে পারব না, আর ঠাকুরেরও ভোগ রেঁধে দিতে পারব না।

কুশারীগৃহিণী। কি ? শেষে ঐ কানাই বসাকের বৌ তোর কাছে এত বড় হ'লো ?

সুনন্দা। না দিদি, আমার কাছে আজ বড় ধর্ম্ম বড়।

কুশারীগৃহিণী। ও, তা হলে তুই বলতে চাস্, তোর বড়ঠাকুর অধর্মের কাজ করেচেন ?

সুনন্দা। তিনি গুরুজন, তাঁর সম্বন্ধে অমন কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ঐ অনাথা বিধবার চোখের জলে আজ আমি সত্যকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি।

কুশারীগৃহিণী। কি বললি হতভাগী? এত বড় কথাটা তুই মুখে বলতে পারলি? কানাই বসাকের বৌএর কথাটাই হলো সত্যি, আর আমাদের সব মিথ্যে?

[সহসা কুশারী মহাশয়ের বিধবা কন্যা দুর্গা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল]

দুর্গা। মা! এই দুপুরবেলা কি আরম্ভ করলে বল তো?

কুশারীগৃহিণী। আমি আরম্ভ করলাম! কান নেই, শুনতে পাসনে হতভাগী? তোর খুড়ী যে পরের কথা নিয়ে যা মুখে আসচে তাই বলচে।

দুর্গা। বাবার খেতে আসবার সময় হয়েচে। এ-সময়ে আর চেঁচামেচি না করে তুমি একটু চুপ করে যাও না মা।

কুশারীগৃহিণী। কি? চুপ করে যাবো আমি? কেন? আমি ওর খাই না পরি?

[সহসা চীৎকার ও চেঁচামেচি শুনিয়া কুশারীমশাই ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল]

কুশারী। (ব্যস্তভাবে) কি গো! ব্যাপার কি?

কুশারীগৃহিণী। (কাঁদিয়া) ছোট-বৌ বলচে তুমি ঠক্ জোচ্চোর মিথ্যেবাদী।

কুশারী। কি?

দুর্গা। আঃ! মা—

[কুশারীগৃহিণী দুর্গার বাধায় নিরস্ত হইলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। তুমি কানাই বসাকের বৌএর সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ।

কুশারী। ফাঁকি দিয়ে নিয়েচি ?

কুশারীগৃহিণী। হাঁ। সে সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে, ও রাঁধতে পারবে না, আর স্বামি-পুত্রকেও খাওয়াতে পারবে না।

কুশারী। সে কি ! কিন্তু এ-সব বৈষয়িক কথা আজ হঠাৎ উঠল কি করে ?

কুশারীগৃহিণী। একটু আগে কানাই বসাকের বৌ এসে আমার সঙ্গে কথা কইছিল। তার কথা শুনে ওর বিশ্বাস হয়েচে যে সত্যিই তার বিষয় তুমি ঠকিয়ে নিয়েচ।

সুনন্দা। কানাই বসাকের বৌএর কথাতেই আমি শুধু বিশ্বাস করিনি। আপনার মুখের কথাতেই আমি বিশ্বাস করেচি। অনেকবার আপনার মুখেই আমি শুনেচি, ঠাকুর কিছুই রেখে যাননি। তা হলে কানাই বসাকের সম্পত্তি কেনার টাকা আপনি পেলেন কোথায় ?

কুশারী। এ-সব কথার মানে কি বৌমা ?

সুনন্দা। এর মানে কেউ জানে তো সে আপনি। বসাক-বৌ দিদির কাছে আজ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল। তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাহুল্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন তা হলে আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী-পুত্রকে খেতে দিতে পারব না।

কুশারী। বৌমা !

কুশারীগৃহিণী। বলি, তোকে কি ভূতে পেয়েচে? ভাসুরের মুখের ওপর এতবড় কথা বলতে তোর লজ্জা করচে না?

[ইতিমধ্যে যদুনাথ তর্কালঙ্কার বিনুকে লইয়া প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া বড়বৌ কাঁদিয়া উঠিলেন]

যদুনাথ। কি হ'লো বৌঠান?

কুশারীগৃহিণী। ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি ছেলের মত করে মানুষ করেচি, তার কি এই ফল?

যদু। কিন্তু ব্যাপার কি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না বৌঠান!

কুশারীগৃহিণী। (সুনন্দাকে দেখাইয়া) ও আজ তোমার দাদার মুখের ওপর বলে কি-না কানাই বসাকের বিষয় তোমার দাদা ফাঁকি দিয়ে নিয়েচেন। ও পাপের বিষয় তোমার দাদা ছেড়ে না দিলে—

কুশারী। বিষয় পাপের হোক, আর পুণ্যেরই হোক বৌমা, সে আমার—তোমার স্বামি-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায় তোমরা আর কোথাও যেতে পারো।

যদু। (ব্যাকুলভাবে) দাদা!

কুশারী। না, না। তুই আমার অমতে যেদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলি, তারপর থেকে আমি অনেকদিন তোর সঙ্গে কথা কইনি। কিন্তু তোর বৌঠান বৌমার মুখ চেয়ে সব ভুলে গিয়েছিল। আমার ভাঙা মনকে সেদিন তোর বৌঠানই জোড়া লাগিয়েছিল। সে মনকে আজ আবার বৌমাই যখন এমন করে ভেঙে দিলেন তখন আর নয়, আর নয়—

[কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিতে মুছিতে কুশারীমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন। বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে যদুনাথের হাত-দুটী ধরিয়া বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। ঠাকুরপো, আমরা যে তোমাকে দিয়ে ছেলের সাধ মিটিয়েচি !

যদু। (সজল-চক্ষে) বৌঠান, তুমিই আমার মা। দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের চেয়ে যে বড়, সে ধর্ম্ম। আমার বিশ্বাস, সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। আম ওকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান। সে কখ্‌খনো ভুল করেনি।

কুশারীগৃহিণী। ঠাকুরপো, তুমিও শেষে এই কথা বললে ! সব ভুলই আমাদের ?

যদু। ভুল—ভুল বৈ কি বৌঠান। আজকের এই ভুল বোঝাবুঝি হয়তো একদিন প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে।

সুনন্দা। (যদুনাথকে) চল, আর নয়।

দুর্গা। খুড়ীমা, তা হলে সত্যিই কি তুমি—

সুনন্দা। হ্যাঁ দুর্গা, আমি যে এ ভিটেয় বসে স্বামি-পুত্রকে খাওয়াতে পারবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেচি।

কুশারীগৃহিণী। ঠাকুরপো, ওর ওই প্রতিজ্ঞাটাই কি বড় হ'লো, আর আমাদের স্নেহ-মমতা ভালবাসা এগুলো কি কিছুই নয় ?

যদু। বলেচি তো বৌঠান, ধর্ম্মের কাছে ওগুলো কিছুই নয়।

[সুনন্দা ধীরে ধীরে আসিয়া বড়বৌকে প্রণাম করিল। পরে বিনুকে বলিল]

সুনন্দা। বড়-মাকে প্রণাম কর।

[বিনু জ্যেঠাইমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুশারী-গৃহিণী বিনুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন]

কুশারীগৃহিণী। সর্ব্বনাশী! এই যদি তোর মনে ছিল, তবে এ-সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্য্যন্ত নিয়ে চললি! তুই কি শ্বশুর-কুলের নামটা পর্য্যন্ত থাকতে দিবি না প্রতিজ্ঞা করেচিস্? বলি, তেজ করে তো যাচ্ছিস্—খাবি কি?

সুনন্দা। ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেছেন, তার অর্দ্ধেকটা তো আমাদের—

কুশারীগৃহিণী। হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোরা না হয় না খেয়ে মরতে পারিস্, কিন্তু আমার বিনু—

সুনন্দা। কানাই বসাকের ছেলের কথাটা একবার ভেবে দেখো দিদি। তার মত একবেলা একসন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে সে ঢের।

[বিনুর হাত ধরিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যদুনাথ তাহাকে অনুসরণ করিল]

কুশারিগৃহিণী। পোড়ারমুখী! এতই যদি তোর মনে ছিল, তা হলে তুই তো অন্য প্রতিজ্ঞা করতে পারতিস! ছেলের প্রতিজ্ঞা করে ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলি? একবারও ভাবলিনে আমি কি নিয়ে থাকবো?

[ব্যাকুলভাবে আছড়াইয়া পড়িলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজলক্ষ্মীর বাড়ী। তখন অপরাহ্নকাল। বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের বাক্স ও কম্বল গুছাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। শ্রীকান্ত ও বজ্রানন্দ দুইটী মোড়ায় বসিয়া পরস্পর আলোচনা করিতেছে]

শ্রীকান্ত। এ ক'দিন এখানে এসে গ্রামের অবস্থা দেখে সত্যিই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি আনন্দ।

বজ্র। ও দেখে মন খারাপ করবার কিছু নেই দাদা। এই হচ্ছে দেশের সত্যিকারের ছবি। আপনি ভাবচেন এই দৈন্য বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়? কিন্তু তা মোটেই নয়।

শ্রীকান্ত। দৈন্য দুঃখ দেয় না, এটা কি-রকম কথা হ'লো সাধুজী?

বজ্র। ঠিকই বলচি দাদা। আমাদের মত যদি সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, তা হলে আমার কথার সত্যতা আপনি সহজেই বুঝতে পারতেন। দুঃখটা সত্যিকারের ভোগ করে মানুষের মন। কিন্তু এদের সে মনের বালাই আমরা রাখিনি, বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙড়ে বার করে দিয়েচি। ওরা যা ভোগ করেচে, ওর বেশী চাওয়াকে এখন ওরা নিজেরাই অন্যায় স্পর্দ্ধা বলে মনে করে।

শ্রীকান্ত। তুমি ঠিকই বলেচ আনন্দ। সত্যিকারের দুঃখ ভোগ করে মানুষের মন। গতকাল কুশারীমশাই-এর স্ত্রীর কাছে তাঁদের পারিবারিক বিবাদের কথা শুনলাম। কুশারীমশাই-এর ভাইয়ের স্ত্রী সুনন্দা স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ বরণ করে নিয়েচে। কিন্তু তার জন্যে তাঁর কোন ক্ষোভ নেই। অথচ কুশারীমশাই-এর স্ত্রী তাদের অভাবে অহরহ দুঃখ ভোগ করচেন।

[ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

রাজলক্ষ্মী। তুমি কি এখনি চলে যাচ্ছ না-কি আনন্দ ?

বজ্র। হ্যাঁ দিদি। শুধু আপনার খাওয়া হয়নি বলেই এতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছিলাম। যে যত্ন করে এ-ক'দিন খাওয়ালেন দিদি, তা কখনই ভুলবো না।

রাজ। যত্ন! তার কতটুকু সুযোগ দিয়েচ ভাই? কিন্তু এখনি কি না বেরোলেই নয় ?

বজ্র। না দিদি, এমনিই ক'দিন হয়ে গেল। আজ এখন না বেরোলেই নয়।

রাজ। সেখানে যে কোথায় খাবে, কোথায় শোবে—আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই।

বজ্র। আগে তো গিয়ে পৌঁছই দিদি।

রাজ। আবার কবে ফিরবে ?

বজ্র। তা ঠিক করে বলতে পারি না দিদি। কাজের ভিড়ে যদি এগিয়ে না যাই তো একদিন ফিরতেও পারি।

রাজ। একদিন ফিরতেও পারো! না না, সে কিছুতেই হবে না।

বজ্র। কিন্তু যাবার হেতু তো আপনাকে বলেচি দিদি।

রাজ। বলেচ ? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তবে এসো।

[কাঁদ-কাঁদভাবে রাজলক্ষ্মী সবেগে ঘরে প্রবেশ করিল। বজ্রানন্দের চক্ষু তাহা এড়াইল না। সে লজ্জিতভাবে শ্রীকান্তকে বলিল]

বজ্র। আমার যাওয়ার বড় দরকার।

শ্রীকান্ত। জানি।

[বজ্রানন্দ ঔষধের বাক্স ও কম্বল কাঁধে তুলিয়া লইয়া বলিল]

বজ্র। আচ্ছা চলি। ওদিকের কাজ যদি মেটে, হয়তো আবার আসব। কিন্তু এখন এ-কথা দিদিকে জানাবার আবশ্যক নেই।

শ্রীকান্ত। বেশ, তাই হবে।

বজ্র। আশ্চর্য্য দেশ এই বাঙলাদেশটা। এর পথে-ঘাটে মা-বোন। সাধ্য কি এদের এড়িয়ে যাই।

[বজ্রানন্দ বাহির হইয়া গেল। শ্রীকান্ত তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দূর হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে রতন একটি লোক সঙ্গে লইয়া, ধামায় সিধা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল]

শ্রীকান্ত। এ কি রতন! এ-সব নিয়ে আবার চললে কোথায়?

রতন। আর বলেন কেন বাবু! মার হুকুম হয়েচে, এই সিধেটা কুশারীমশাই-এর ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে পৌছে দিতে হবে।

শ্রীকান্ত। ও। আচ্ছা যাও।

[রতনের প্রস্থান]

[দূর হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীকান্তর নিকট দাঁড়াইল]

রাজ। আনন্দ চলে গেল?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

রাজ। আবার কবে ফিরবে কিছু বলে গেল?

শ্রীকান্ত। না।

রাজ। যদি সে কখনো ফিরে আসে তো তার বাপ-মায়ের কাছে একদিন তাকে ফিরিয়ে দেব, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

শ্রীকান্ত। কিন্তু তার জন্যে তোমার এত গরজ কিসের?

রাজ। অমন ছেলে চিরদিন ভেসে বেড়াবে! না না, তা কিছুতেই হবে না। আচ্ছা, তুমি নিজেও তো সংসার ছেড়েছিলে—সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে সত্যিকার কিছু আনন্দ আছে?

শ্রীকান্ত। আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হইনি। তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটা আমি তোমাকে দিতে পারব না। যদি কোনদিন সে ফিরে আসে, তা হলে এ-সংবাদ তাকেই জিজ্ঞেসা ক'রো।

রাজ। আচ্ছা বাড়ীতে থেকে কি ধর্ম্মলাভ হয় না? সংসার না ছাড়লে কি ভগবান পাওয়া যায় না?

শ্রীকান্ত। এর কোনোটার জন্যে আমি ব্যাকুল নই লক্ষ্মী। এ-সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে তুমি কোরো না। আবার হয়তো আমার জ্বর আসতে পারে।

রাজ। আমার কিন্তু মনে হয় সংসারে আনন্দর সমস্তই আছে। তবুও সে ধর্ম্মের জন্যে এ-বয়সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেচে। কিন্তু তুমি তো তা পারনি?

শ্রীকান্ত। না। এবং ভবিষ্যতে তা পারব বলে ত মনে হয় না।

রাজ। কেন মনে হয় না?

শ্রীকান্ত। তার প্রধান কারণ, যাকে ছাড়তে হবে সেই সংসারটা যে আমার কোথায়, কি প্রকার, তা আমার জানা নেই। এবং যার জন্যে ছাড়তে হবে সেই পরমাত্মার প্রতিও আমার লেশমাত্র লোভ নেই। এতদিন তাঁর অভাবেই কেটে গেছে, এবং বাকী ক'টা দিনও অচল হয়ে থাকবে না এই আমার ভরসা।

[সহসা রতনের সহিত কয়েকজন লোক অগ্রসর হইল। তাহাদের সহিত একজন প্রৌঢ়-গোছের লোক; তাহার পরিধানে হরিদ্রারঙের ছোপানো একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের-মালা, কাঁধে গামছা, হাতে শালপাতায় একটি টাকা ও একটী সুপারী। রতনকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী বলিল]

রাজ। সিধে দিয়ে এলি রতন?

রতন। হ্যাঁ।

রাজ। কিছু বললে?

রতন। না।

[রাজলক্ষ্মী রতনের সঙ্গের লোকদের দেখাইয়া বলিল]

রাজ। এরা কি চায়?

রতন। মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেচে। (সঙ্গের প্রৌঢ় লোকটির প্রতি) এসো না হে, দিয়ে যাও না।

[রাজবরণ-হাতে লোকটির নাম মধু ডোম। সে সসঙ্কোচে শালপাতার উপরিস্থিত টাকা ও সুপারীটি রাজলক্ষ্মীর পায়ের কাছে রাখিয়া, মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল]

মধু। মাঠান, আজ আমার মেয়েটার বিয়ে।

[রাজলক্ষ্মী পুলকিত-চিত্তে রাজবরণ গ্রহণ করিয়া বলিল]

রাজ। মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয়?

রতন। না মা, না—তা নয়। যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়। এরা এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন? তাই কত কষ্টে—

রাজ। (রাজবরণ মাটিতে রাখিয়া) কষ্ট! ও! তবে থাক্, থাক্। এও দিতে হবে না। তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে।

মধু। কিন্তু মা, ওটো আপনি না নেওযা করলে আমার মেয়েটার যে বিয়াই হবেক না।

রাজ। আমি না নিলে বিয়ে হবে না!

রতন। হ্যাঁ মা, এ-দেশের এই নিয়ম। জমিদারকে রাজবরণ দিয়ে তবে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়।

রাজ। কিন্তু ওদের কষ্টের এই টাকা, ও কি আমি নিতে পারি রতন?

মধু। কিন্তু আপনি নেয়া না করলে আমার মেয়েটার যে বেয়া হবেক নাই মা।

[শ্রীকান্ত রাজবরণ হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল]

শ্রীকান্ত। আচ্ছা 'আমি নিলাম। তোমরা বাড়ীতে গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করো গে।

রাজ। এ ভালই হ'লো। যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে তুলে নিলেন।

মধু। (কৃতজ্ঞতায় হাত জোড় করিয়া) হুজুর! পহর রেতেই লগন,—একবার পায়ের ধুলো দেযা করবেন নাই?

রাজ। ঐ যে ওখানে শানাই বাজচে। ঐটে বুঝি তোমার বাড়ী?

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ মা।

রাজ। আচ্ছা, যদি সময় পাই আমিও গিয়ে না হয় একবার দেখে আসব। তোমার নামটি কি?

মধু। আজ্ঞে মধু ডোম।

রাজ। ওরে রতন! বড় তোরঙ্গটা খুলে মধুর মেয়েটাকে একখানা নতুন শাড়ী দিয়ে আয়। এদেশে মিষ্টি বোধ হয় কিছু পাওয়া যায় না?

রতন। না মা, বাতাসা মেলে।

রাজ। বেশ, তা হলে অমনি তাও কিছু কিনে নিয়ে, কাপড় আর বাতাসা ওদের বাড়ী দিয়ে আয়।

রতন। আচ্ছা মা।

[রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

রাজ। হাঁ মধু, তোমার মেয়ের বয়স কত ?

মধু। আজ্ঞে এই ন বছর হবেক।

শ্রীকান্ত। তোমার জামাইযের বাড়ী কোথায় ?

মধু। আজ্ঞে, এই গঙ্গামাটির পাচ কোশ উত্তুরে।

শ্রীকান্ত। তোমার জামাইয়ের বয়স কত ?

মধু। আজ্ঞে—তা দেড়-কুড়ি দু-কুড়ির বেশী হবেক না।

রাজ। তোমার মেয়ের বিযেতে কতগুলি লোক খাবে ?

মধু। আজ্ঞে—ঐ কথাটা তো বলা করা যাচ্ছে না। ও-গাঁয়ে আমাদের জাত য্যাত সবাই চাষ-বাস করে; প্রায় সবারই অবস্থা ভাল। কাজেই তারা কত লোক আসা করবেক বলা যাচ্ছে না। এই ভয়েই তো কাঁটা হয়ে আছি। কি করে যে মানীর মান রাখবো! ইদিকে চিঁড়া গুড় দই সব যোগাড় করা হইছে। থান-দুই করে বড় বাতাসাও দিতি পারবো। কিন্তু তা বাদেও, উরা যদি গোল বাধায় মা, তা হলে আপনাকে রক্ষে কোরতে হবে।

রাজ। কিছু গোল বাধবে না মধু। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। যা খাবার জিনিস তুমি যোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল তা খেয়ে খুশী হয়ে চলে যাবে।

মধু। সেই আশীর্ব্বাদ করেন মাঠান, ভালোয় ভালোয় যেন জোড় লগনটি হয়ে যায়। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া) তা হলে আসি মাঠান।

রাজ। এসো।

[মধু প্রণাম করিয়া সদলবলে চলিয়া গেল। শ্রীকান্ত অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণের মধ্যে যদুনাথ তর্কালঙ্কার তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল]

যদু। নমস্কার!

শ্রীকান্ত। নমস্কার, বসুন।

যদু। আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা। ইতিপূর্ব্বেই আমার আসা কর্ত্তব্য ছিল। ভারি ত্রুটি হয়ে গেছে।

শ্রীকান্ত। দেরী করে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। কারণ আপনি একেবারে না এলেও আমি ত্রুটি নিতাম না। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

যদু। অসময়ে এসে হয়তো আপনার কাজে ব্যাঘাত করলাম। আর একদিন আসবো। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীকান্ত। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন।

যদু। আমি সামান্য ব্যক্তি। প্রয়োজনও যৎসামান্য। মা-ঠাকরুণ আমাকে স্মরণ করেচেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে,—আমার কিছুই নেই।

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাজ। আপনি উঠবেন না, বসুন।

যদু। মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেকদিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। এতে প্রায় আমাদের পনের দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি ত অকাল চলচে, ব্রত-নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য্য হয়ে তাই জিজ্ঞেস করছিলেন—

রাজ। আপনার ব্রাহ্মণী শুধু বারব্রতের দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেচেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার দিনক্ষণগুলোও আমার কাছে শিখে যেতে বলবেন।

যদু। এতবড় সিধেটা কি তা হলে মা—

রাজ। তর্কালঙ্কার মশাই! শুনেচি আপনার ব্রাহ্মণী ভারি রাগী মানুষ, বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, না হলে এ-কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

যদু। (উচ্চহাস্যে) না মা, রাগী হবে কেন? নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারব না। তিনিই আসবেন, একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

শ্রীকান্ত। তর্কালঙ্কার মশাই! আপনার ছাত্র ক'টি?

যদু। আজ্ঞে পাঁচটি। এদেশে ত বেশী ছাত্র পাবার যো নেই—অধ্যাপনা কেবল নাম মাত্র।

শ্রীকান্ত। সব ক'টিকেই খেতে-পরতে দিতে হয়?

যদু। না। বিজয় ত দাদার ওখানেই থাকে। একটির বাড়ী গ্রামের মধ্যেই। কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।

রাজ। এই দুঃসময়ে এ তো সহজ নয় তর্কলঙ্কার মশাই—

যদু। কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটী প্রাণী জানি। কিন্তু তবু তো ভগবানের উদয়াস্ত আটকে থাকে না মা। তা ছাড়া উপায়ই বা কি! অধ্যায়ন-অধ্যাপনা এ তো ব্রাহ্মণেরই কাজ। আজ তা হলে উঠি মা?

রাজ। আসুন।

[লক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ হইয়া যদুনাথকে প্রণাম করিল। যদুনাথ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে শ্রীকান্তকে নমস্কার করিলেন]

যদু। নমস্কার।

[শ্রীকান্ত প্রতিনমস্কার জানাইল। যদুনাথের প্রস্থান]

রাজ। হ্যাঁ, ভাল কথা, ভাবচি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কাল খাওয়া-দাওয়ার পর কুশারীমশাইয়ের ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে যাব।

শ্রীকান্ত। বুঝেচি। তাদের ঝগড়াটা তুমি মেটাতে চাও।

রাজ। হাঁ, কুশারীমশাই-এর বৌয়ের কাছে তাদের সাংসারিক দুঃখের কথা শুনে পর্য্যন্ত মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

শ্রীকান্ত। তা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কেন? তোমার বাহন রতনকে নিয়েও তো যেতে পারো—

রাজ। এখানে ও-বাহনে আর কুলোবে না।

[রাজলক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করিল। মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল; দেখা গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অদূরে রক্ষিত একটি হ্যারিকেনের আলো জ্বলিতেছিল। সহসা মধু ডোমের সম্বন্ধীর সহিত জন-পাঁচ-ছয় লোক বেড়ার অপর পার হইতে আসিযা ডাকিল]

মধুর সম্বন্ধী। হুজুর—বাবু মশাই—

[রতন ঘর হইতে ছুটিয়া তাহাদের নিকট গিয়া বলিল]

রতন। কি? কি-ব্যাপার কি? ষাঁড়ের মতন অমন চেচাচ্ছিস্ কেন?

মধুর সম্বন্ধী। বড় বিপদ হইছে, হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা করবার চাই।

রতন। তোদের বিপদ ত লেগেই আছে। যা যা, এখন দেখা হবে না, কাল সকালে আসিস।

মধুর সম্বন্ধী। এই স্তাখ। নালিসটা এখন না জানালে যে বিয়েটা পণ্ড হয়ে য়াবেক গো।

রতন। তোদের বিয়ে হোল আর না হোল বড় বয়েই গেল। যা বেরো, বেরো বলছি।

[রতনের চেঁচামেচিতে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী ঘর হইতে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল]

রাজ। কি? ব্যাপার কি রতন? অমন করে কাদের তাড়াচ্ছিস্?

রতন। আর বলেন কেন মা? ব্যাটাদের কথায় কথায় নালিশ। সময় নেই অসময় নেই, নালিশ অমনি জানালেই হ'লো!

রাজ। তুই বা রাগ কচ্ছিস্ কেন? নালিসই যদি ওরা জানাতে এসে থাকে, তা ওদের ছেড়ে দে না কেন? কি বলতে চায় ওরা শুনি। এসো সব।

[রতন দরজা ছাড়িয়া দিল। মধু ডোমের সম্বন্ধী ও গ্রামবাসি-গণ সসঙ্কোচে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের নিকট আগাইয়া আসিল]

রাজ। কি? ব্যাপার কি?

মধুর সম্বন্ধী। মা, বড় বিপদ হইছ্যা—তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম।

[মধু ডোমের সম্বন্ধীর সহিত অপর যে সকল গ্রামবাসীগণ আসিয়াছিল—তাহারা তারস্বরে একযোগে চীৎকার করিয়া বলিল]

মধুর লোকেরা। হুজুর! বাবুমশাই! এর বিচারটা আপনাকে করতেই হবে।

[একসঙ্গে সকলে চীৎকার করায় রতন বিরক্ত হইল—সে তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিল]

রতন। ষাঁড়ের মতন সব চেঁচাচ্ছিস্ কেন? যা বলবি এক এক করে বল্।

শ্রীকান্ত। (রতনকে বাধা দিয়া) যাক যাক। তার পর কি ব্যাপার বল ত?

মধুর সম্বন্ধী। হুজুর! বাবুমশাই! আমার বুনুই মধু ডোমের মেয়ের বিয়েটা হতি হতি বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীকান্ত। (সবিস্ময়ে) হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল?

মধুর সম্বন্ধী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুমশায়। আপনি দয়া করে যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন, মেয়েটার হয়ত বিয়েই হবেক না।

রাজ। কেন? হয়েচে কি?

মধুর সম্বন্ধী। সে অনেক কথা মা। গিয়ে একবার দেখা করবেন চলুন বাবুমশায়, বরেদের পুরুত কি কাণ্ডটাই করেছে। ফুল, জল সব বেবাক্ টান মেরে ফেলাহ দিছে—আমাদের রাখাল পুরুতের মুখটো চেপে ধরেছে।

রাজ। মুখ চেপে ধরেচে! কেন?

মধুর সম্বন্ধী। আমাদের রাখাল পুরুত নাকি ভুল মন্ত্র বলা করছিল—

রতন। (ধমক দিয়া) তোদের আবার পুরুত কিরে? ভারি তো বিয়ে, তার আবার পুরুত! এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাখ পেয়েচিস্ যে, বিয়ে দিতে পুরুত আসবে?

মধুর সম্বন্ধী। (লজ্জিতভাবে) আজ্ঞে তা ঠিক। বামুন বলে অবিশ্যি আমাদের কিছু নাই। তবে কি-না রাখাল আর শিবু উয়াদের গলায় পৈতা আছে। আমাদের ছুঁয়া জল ওরা খাওয়া করে না। আমাদের যা-কিছু পূজোপাঠ ওরাই করে।

রাজ। তা না হয় ভুল মন্ত্র বলেইছিল—তাই বলে তার মুখ চেপে ধরলো?

মধুর সম্বন্ধী। হ্যাঁ মা। এখন বলা করছে, এরকম মন্ত্র বলা করলে সে কিছুতেই বিয়েটা হতে দিবেক না। আমার বুনুই উও তো বিয়ের

কাছে বসে পড়েছে। কোন উপায় করতি না পেরে, শেষে নালিশ জানাতে আপনাদের কাছে আমাকে পাঠায়ে দিলে।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা চল। দেখে আসি ব্যাপারটা। (লক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া) তুমিও চল না। বাড়িতে একলা আর কি করবে।

রাজ। বেশ চল। (রতনের প্রতি) ওরে রতন! ঘর দোর ছেড়ে তুই যেন কোথাও যাস্‌নে। আমরা এখনিই আসচি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[মধু ডোমের বাড়ির উঠান—পার্শ্বে একখানি জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র কুঁড়ে। সেই কুঁড়ের সংলগ্ন দাওয়ায় বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়েকে দেখা গেল। উঠানে কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের লোকেরা চীৎকার ও চেঁচামেচি করিতেছে। মধ্যস্থলে বর ও তাহার পাশে কনে। কনের পরণে একটী লাল চেলী—কপালে চন্দন, মাথায় সিঁথি। বরের কপালে বড় বড় কয়েকটী চন্দনের ফোঁটা—পরণে অতি সাধারণ শনের ধুতি-চাদর। বরের যদিচ বয়স হইয়াছে কিন্তু মাথায় বিশেষ বড় নয়—এক-কথায় বামন বলা চলে। বরের ক্ষুদ্র মুখে একজোড়া বেশ লম্বা গোঁফ। স্থূলকায় শিবুপণ্ডিত ক্ষীণজীবি রাখাল পণ্ডিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে ও চীৎকার করিয়া বলিতেছে]

শিবু। না না, এ বে'ই নয়। যা তা মন্তর অমনি বলা-করলেই হোল?

প্রথম বরপক্ষ। ঠিকই তো। এরকম বিয়ে আমরা কিছুতেই হতে দেব না। বর তুলে নিয়ে চলে যাব।

প্রথম কন্যাপক্ষ। উঃ, বর অমনি তুলে নিয়ে গেলেই হোল? দেখি তোল্ দেখি বর—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে?

মধু। (করযোড়ে) আঃ—কেন আর চিচামিছি ফর্চ্ছেন? হুজুরকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি যখন এখনই গায়ে আছেন, তখন তিনি এসে যা বলা করবেন তাহ হবেক্।

দ্বিতীয় কন্যাপক্ষ। ঠিকই তো।

রাখালপণ্ডিত। এখনও বোলছি শিবু পণ্ডিত, তুমি আমার হাতটো ছেড়ে দাও—ভাল হবে নাই বলে দিচ্ছি।

শিবু। (তাড়া দিয়া) কি ভাল হবে নাই? তু আমার কোরবি কি?

প্রথম কন্যাপক্ষ। (শিবু পণ্ডিতের প্রতি) তু তো আচ্ছা নচ্ছার লোক হে! ও মন্তর ঠিকই বলা করুক আর বেঠিকই বলা করুক, তুমি ওর গায়ে হাত দিবার কে বটে?

বর (বিপিন)। (শিবুকে) আরে কেন ঝামেলা কোরছেন পণ্ডিত-মশায়? হাতটা ছেড়ে দেন না কেনে?

শিবু। তু চুপ মার্। তু না বর? বরের আবার রোযাবি দেখ!

দ্বিতীয় কন্যাপক্ষ। বর যখন বলা করছে, তখন তুমি হাতটো ছেড়ে দিতে বাধ্য।

শিবু। বর কে? বরের বাপ না বোললে, আমি কিছুতেই হাত ছাড়ব নাই।

কনের-মা। হেঁইগো! চুপ করে রইলে কেনে? উওদের পুরুতকে বলা কর আমাদের পুরুতের হাতটো ছেড়ে দিতে।

প্রথম কন্যাপক্ষ। কি গো বরকর্ত্তা? মুখে বুঁজে রইলে কেনে? তোমার পুরুতকে আমাদের রাখাল পণ্ডিতের হাত ছেড়ে দিতে বল।

বরকর্ত্তা। হাতটো ছেড়ে দিতে বলে একটা ফিসাদে পড়ি আর কি! ছাড়া পেয়ে শেষে যদি তোমাদের পুরুত ঐ কোশাকুশী দিয়ে আমার শিবুপণ্ডিতের কপাল ফাটায়ে ছ্যায?

শিবুর সম্বন্ধী। ঠিক বলেছ।

মধু। না-না—আমাদের রাখাল পণ্ডিত সেরকম লোক নয়।

শিবুপণ্ডিত। না, লয বৈকি! তোমরা তো ভারি জান হে, উও বলুক না—সিবার ঐ পাশের গাঁয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে কোশাকুশী ফেলাবে আমার এই স্বমুন্দীর কপাল ফাটায়ে দেয নাই?

রাখালপণ্ডিত। তুযোর স্বমুন্দা আমার পৈতেটো ছিড়ে দিতে এই।হলো কেনে?

শিবুর সম্বন্ধী। কি? আমি তোর পৈতেটো ছিঁড়ে দিতে গেইলাম?

রাখালপণ্ডিত। যাস্ নাই?

শিবুর সম্বন্ধী। হ, গেহছিলাম ত। উও ভারি তুয়োর গুলিস্বতোর পৈতি—তার আবার দেমাক। পৈতি কারে বলে ছ্যাথ—হাতেকাটা টোন স্বতোর পৈাত।

শিবুপণ্ডিত। বামুনগিরি কোরবি আর মন্তর বলা করতে পারবি নাই। তুয়োর পৈতে ছিড়লে নাইতো কি?

[মধু ডোমের সম্বন্ধী ও গ্রামবাসীদের সহিত রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত সহসা প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শিবুপণ্ডিত ভয়ে ভয়ে রাখাল পণ্ডিতের হাত ছাড়িয়া দিল। রাখালপণ্ডিত কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল]

রাখালপণ্ডিত। দেখেন বাবুমশায়! শিবে আমার কি হালটো করেছে।

শিবুপণ্ডিত। হুজুর! মন্তরের 'ম' জানে নাই ব্যাটা—আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত। আর একটুক হ'লে ও বেটাই আজ ভেঙে দিত।

রাখাল। (মুখ ভেঙ্গাইয়া) হ্যাঁ দিত! হারামজাদা লচ্ছার—পাঁচখান গাঁয়ের ছাদ্দ, বে, নিত্যি দেয়া করছি, আর আমি জানি নাই মন্তর?

শ্রীকান্ত। (বাধা দিয়া) তা থাক্। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল ত?

রাখাল। স্থাখেন হুজুর! ইযে লচ্ছার আমার ফুল জল সব ফ্যালাই দেছে। আমার মুখটো চেপে ধরে মন্তর বলা করতে দেয নাই—আর আপনি তো নিজে চোখে দেখা করলেন হুঁজুর, কিরকম আমার হাতদুটো চেপে ধরেছিল, এই দেখেন হুজুর, অক্ত জমে রযেছে।

শিবু। (শ্রীকান্তর নিকট আগাইয়া আসিয়া) তা হলে আসল কথাটা আপুনাকে বলি বাবুমশায়। ও ব্যাটা গণ্ডমুরুক্ষু, মন্তর-তন্তর কিছুই জানে নাই। যা তা বলা করে দুটো ফুল ফেলায়ে লোক ঠকায়ে বেড়ায।

শিবুব সম্বন্ধী। উও ভারী ঝগড়াটে হুজুর।

শ্রীকান্ত। তা যাক, ও নিয়ে এখন ঝগড়াঝাটি করে কাজ নেই, বিযে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আছি। উপস্থিত রাখালই মন্ত্র পড়াক। যদি কোথাও সে ভুল করে, তা হলে সে তোমাকেই আসন ছেড়ে দেবে।

শিবু। যে আজ্ঞে হুজুর।

শ্রীকান্ত। (রাখালের প্রতি) কি হে, তুমি রাজী?

রাখাল। আজ্ঞে হাঁ বাবুমশায়, আপনার হুকুম—ইএর আবার কথাটো কি?

শ্রীকান্ত। বেশ তা'হলে পড়াও মন্তর। (হাত তুলিয়া নির্দেশ করিয়া বলিল) এই, সব বস—বস। গোল কোরো না।

[সকলে বসিল। ইতিমধ্যে মধুডোমের সম্বন্ধী দু'খানা টুল আনিয়া রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে বসিবার জন্তে দিল]

মধুর সম্বন্ধী। বসুন হুঁজুর মা বসুন।

(রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত বসিল)

[রাখাল পুরোহিত আসন গ্রহণ করিয়া মধু ডোমের হাতে কয়েকটি ফুল এবং বরকন্যার দুই হাত একত্র করিয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল]

রাখাল। বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বিপিন (বর)। মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ। (প্রণাম)

রাখাল। (কন্যাকে) বল, ভগবতি ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

[বালিকা কন্যা এ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না, সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার তাহার দিকে ও একবার তাহার পিতার দিকে চাহিতে লাগিল—রাজলক্ষ্মী মন্ত্রের ব্যবস্থা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিলেন]

শিবুর সম্বন্ধী। আরে দূর মুরুক্ষু! ওইটুকু বিটিয়া, ও কি তোর ঐ মন্তর উচ্চারণ করতি পারে?

শ্রীকান্ত। (গম্ভীর ভাবে) ঠিকই তো। মেয়ের হোয়ে ওর বাপই না হয় মন্তরটা বলে দিক্।

রাখাল। আজ্ঞে হাঁ, তা হলিও হবেক। (মধুর প্রতি) বল মধু, মেয়ের হয়ে মন্তর বল। বল, ভগবতি ডোমায় পুত্রায় নমঃ।

শিবু। (চীৎকার করে) ও মন্তরই নয়। এ বেই হোলো না।

[রাজলক্ষ্মী মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছিল। শ্রীকান্ত তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে শিবু পণ্ডিতকে বলিল]

শ্রীকান্ত। বেশ। মন্তর যদি ঠিক মত বলাই না হয়ে থাকে, তা হোলে এবার তুমিই মন্তর পড়াও।

শিবু। যে আজ্ঞে হুঁজুর। তা হোলে আপনি থেকে আমার দক্ষিণেটোর ঠিক করে দ্যান্।

মধু। রাখাল পণ্ডিতকে সিকি দক্ষিণে দিযা করে আপনাকে না হয় বারো আনা দিয়া করবো পণ্ডিত মশায়।

শ্রীকান্ত। বেশ বেশ, এ খুব ভালো কথা। এখন আর গণ্ডগোল না কোরে বিয়েটা সেরে নাও।

শিবু। যে আজ্ঞে। রাখালের দোষ নাই বাবুমশায। বেপারটো হইছে, আসল মন্তর আমি ছাডা ইদেশে আর কেউ জানেই না। যাক আপনি যখন হুকুম কোবেছেন, তখন বেশী দক্ষিণা আমি লিব না। আমি এখান থেকেই মন্তর পাঠ কোবছি। রাখাল বরং উওদেরকে বলা করাক— বল, মধু ডোমায কন্যাস ভূর্জ্যপত্রং নমঃ।

[রাখাল বরকে পড়াইল। বর উক্ত মন্ত্র পুনরাবৃত্তি কবিল। পরে শিবু মধু ডোমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল]

মধু। এবার তুমি বল। বল, ভগবতি ডোমায পুত্রায সম্প্রদানং নমঃ।
(মধু যথারীতি আবৃত্তি করিল)

তৃতীয় কন্যাপক্ষ। সত্যি, শিবু পণ্ডিতের পেটে কিছু আছে বটেক।

চতুর্থ কন্যাপক্ষ। সত্যি এসব মন্তর তো ইহার আগে আমরা শুনিই নাই। রাখালপণ্ডিত সত্যিই এতদিন আমাদের ঠকায়ে আসছিল।

[শিবু এবার বরের হাতে ফুল দিয়া কহিল]

শিবু। বিপিন, এবার তুমি বলা কর, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত কাপড় প্রদানং সাহা।

[বিপিন অর্থাৎ বর থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে উপোরক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিল]

শিবু। ইবার বরকনে দুজনায় বল, যুগল মিলনং নমঃ।

[বরকন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল]

শিবু। শাঁখ বাজাও—শাঁখ বাজাও। যাও, বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাও।

[শঙ্খধ্বনির মাঝে বরকন্যাকে ঘরের দিকে লইয়া যাইতে দেখা গেল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[যদুনাথ তর্কালঙ্কারের বাড়ি—একখানি জরাজীর্ণ আটচালা। তাহারই সম্মুখে অপরিসর দাওয়া। এই দাওয়ার উপর একটী কাঠের উনুন। এই উনুনের ওপর বালির কড়া চাপাইয়া সুনন্দা মুড়ি ভাজিতেছিল। তাহারই অদূরে একখণ্ড পিঁড়ীর উপর পুঁথী রাখিয়া অজয় যোগ-বশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িতেছিল। অজয় কোথাও পাঠে ভুল করিলে সুনন্দা তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন]

অজয়। বশিষ্ঠ বলিলেন—হে রাঘব! রাজা যেমন নীতিবাক্য শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, তেমনি যার হৃদয়ে বিবেক উৎপন্ন হয়েছে, এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শোনার সেই ব্যক্তি অধিকারী।

সুনন্দা। হুঁ। বশিষ্ঠ এই কথা বোলে রামচন্দ্রকে বললেন, তোমার মধ্যে এই সমস্ত গুণ বর্তমান, সুতরাং তুমি আমার উপদেশ শোন।

[এই ভাবে পড়া যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, ইহারই মাঝে বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। মা! জমিদারবাবু আর জমিদার গিন্নী এসেছেন। জিগ্যেসা করলেন, তর্কালঙ্কার মশায় কোথায়? বোললাম, হাটে গ্যাছেন। শুনে বোললেন, আমরা না হয় ততক্ষণ বাইরে একটু অপেক্ষা করছি।

সুনন্দা। না—না, সেকি কথা বিজয়! ওঁদের তুমি এখানেই নিয়ে এস।

[বিজয় চলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা ঘরে প্রবেশ করিল এবং পুনরায় একটি কম্বলের আসন লইয়া বাহিরে আসিল। ইতিমধ্যে বিজয় রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে লইয়া প্রবেশ করিল]

সুনন্দা। (আগাইয়া গিয়া) আসুন—আসুন। (শ্রীকান্তকে কম্বলের আসনটী দেখাইয়া) বসুন। উনি হাটে গ্যাছেন, এক্ষুনি ফিরে আসবেন।

রাজলক্ষ্মী। হাট এখান থেকে কতদূর?

সুনন্দা। বেশী দূর নয়, এই ক্রোশ দেড়েক। (পরে অজয়কে বলিলেন) অজয়, তুমি একটু তামাক সেজে দাও ত বাবা!

শ্রীকান্ত। (বাধা দিয়া) না—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, তামাকের প্রয়োজন নেই।

সুনন্দা। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারব না, পান আমাদের বাড়িতে নেই।

অজয়। নেই? তা হলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গ্যাছে মা?

সুনন্দা। ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না, হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? (হাসিয়া রাজলক্ষ্মীকে) জানেন, ও-রবিবারে ছোট মোহন্ত ঠাকুরের আসবার কথা, একপয়সার পান কেনা হয়েছিল, সে প্রায় দিন দশেকের কথা। এতেই অজয় আশ্চর্য্য হয়ে গ্যাছে, পান হঠাৎ ফুরুলো কি করে?

অজয়। (অপ্রস্তুত ভাবে) বাঃ—এই বুঝি! তা হলেই বা? ফুকলেই বা?

রাজ। (হাসিয়া) সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষ মানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে?

অজয়। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) দেখুন ত—দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা। হ্যা, মা ভাবেন বৈকি! না দিদি, আমার অজয়েই হ'লো বাড়ির গিন্নী, ও সব জানে।

রাজ। ঠিকই তো। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে মায় বাবুগিরি পর্য্যন্ত, এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

অজয়। কেন পারব না? বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল?

রাজ। ঠিকই তো!

সুনন্দা। বামুন পণ্ডিতের ঘরে হরতুকিই যথেষ্ট, খুঁজলে এক আধটা সুপুরীও হয়ত পাওয়া যেতে পারে, আচ্ছা আমি দেখছি।

[সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইলে রাজলক্ষ্মী তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল]

রাজ। হরতুকি আমার সইবে না, সুপুরীতেও আমার কাজ নেই। স্থির হয়ে বস, দুটো কথা কই। (সুনন্দাকে নিজের কাছে বসাইয়া শ্রীকান্তকে বলিল) ছাথ, আমি ভেবেছিলাম, সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েছে।

সুনন্দা। বয়স হয়নি! দেখছেন না আমার কত বড় ছেলে!

অজয়। মা, ওটা তাহলে রেখে দিই?

[সুনন্দা ঘাড় নাড়িল—অজয় পুঁথি গোছাইতে লাগিল]

রাজ। ওটা কিসের পুঁথি অজয়?

অজয়। যোগবাশিষ্ঠঃ।

রাজ। তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আব তুমি পড়ে শোনাচ্ছিলে বুঝি ?

অজয়। না আমি মার কাছে পড়ি যে।

সুনন্দা। (বাধা দিয়া) পড়াবার মত বিদ্যে মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুর বেলা একলা সংসারের কাজ করি, উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না। ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায়, তার বারো আনা আমি শুন্তে পাই না। ওরা যা হোক একটা বলে দিলো।

(পুঁথি লইয়া অজয়ের প্রস্থান)

রাজ। তোমায় দেখে ইচ্ছে হোচ্ছে, আমিও তোমার চেলা হয়ে যাই। একে তো জানিনে কিছুই, তাও আবার আহ্নিক-পূজোর কথাগুলো যদি ঠিক মত বোলতে পারতুম!

শ্রীকান্ত। ওর জন্যে আক্ষেপের কারণ নেই লক্ষ্মী। আজ থেকেই তুমি না হয় ওঁর চেলা হোয়েই পড়। আমি বরং উঠি।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

সুনন্দা। আপনি এরই মধ্যে চলে যাবেন ?

শ্রীকান্ত। কি কোরবো, আমার তো আর কথা কইবার লোক নেই ?

সুনন্দা। একটু বসুন না, আপনার কথা কইবার লোক এক্ষুনি এলেন বলে।

শ্রীকান্ত। আজ আর নয়। আর একদিন আসব।

(প্রস্থান)

সুনন্দা। ভারী অন্যায় হয়ে গেল দিদি। এতক্ষণ বসে রইলেন, ওঁর সঙ্গে দেখা হোল না।

রাজ। তাতে কি হয়েছে। বরং আমরাই অসময়ে এসে পড়েছি।

সুনন্দা। না—না, অসময় আবার কি? শুনলাম আমার বড় জা একদিন নেমন্তন্ন করে আপনাদের নিয়ে গিয়ে ছিলেন?

রাজ। হ্যাঁ। কথায় কথায় তার কাছে জানতে পারলাম, তর্কালঙ্কার মহাশয় কুশারী মহাশয়ের সহোদর। তোমরা পৃথক হয়ে চলে আসায় কুশারী গিন্নী খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন।

সুনন্দা। জানি, তাঁর খুবই কষ্ট হোয়েছে। কিন্তু কি করব? আমার বাবা সন্ন্যাস গ্রহণের দিন আমায় আশীর্ব্বাদ কোরে বলেছিলেন -মা, ধর্ম্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই, বাবার আশীর্ব্বাদ মাথায় নিযে সব ত্যাগ করে আমায় চলে আসতে হয়েছে।

রাজ। জানি—কোন কিছুই আজ আমার কাছে অজানা নেই। ধর্ম্মের জন্যে স্বেচ্ছায় যে সব কিছু ত্যাগ কোরতে পারে, তাকে দেখা, তার সংস্পর্শ লাভ করার লোভ কিছুতেই আমি সংবরণ করতে পারলুম না। শুনেছি, তুমি তোমার ধার্ম্মিক বাপের কাছে অনেক শাস্ত্র পড়েছ। বোলতে পার বোন, পুণ্যার্জনের পথ নির্বিঘ্ন হয় কি কোরে?

সুনন্দা। হয় বৈকি! সে পথের সন্ধান আমি দিতে না পারলেও উনি এলে নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে পারবেন।

রাজ। আজ তাহলে উঠি বোন। কাল আবার আসব।

সুনন্দা। উঠবেন? কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে দেখা হোল না।

রাজ। তাতে কি হয়েছে? কাল ত আসছি। দেখা না করে কাল আর কিছুতেই ফিরব না।

সপ্তম দৃশ্য

[শ্রীকান্তর ঘর। তখন সন্ধ্যা। ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। রতন গজ গজ করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল ও আলো জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল

রতন। বাপারে বাপ! এ সংসারে থেকে দিনদিন যেন হাঁপিয়ে উঠছি। কুশারী মশায়ের ছোট ভায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত মা সারাদিন ওখানে, আর বাবু এদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

[অপর দিক দিয়া শ্রীকান্তর প্রবেশ। হাতের ছড়ি ও গায়ের চাদর আলনায় রাখিতে রাখিতে বলিল]

শ্রীকান্ত। কি রতন? কি হোল?

রতন। না বাবু, হবে আর কি! এই মার কথা বলছি আর কি—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে সারাদিন ওদের বাড়ি কাটাচ্ছেন। এই দেখুন না, সন্ধ্যে হয়ে এল এখনও বাড়ি ফিরলেন না।

শ্রীকান্ত। তাই নাকি? আজ এখনও ফেরেন নি?

রতন। না। তাই বলছি—সংসারের সব দিকে আমার যে মার চোখ দুটো সব সময় ঘুরে বেড়াত, সেই মার এখন আর সংসারের দিকেও চাইবার সময় নেই।

শ্রীকান্ত। ধর্ম্ম। এত ভাল কাজ রতন। তা তুমিই বা রাগ করছ কেন?

রতন। রাগ আর কি করব বাবু? তবে দুঃখু হয় আপনার জন্যে। মা যেদিন থেকে তর্কালঙ্কার মশায়ের বাড়িতে যাওয়া আসা আরম্ভ কোরেছেন—আপনিও আর সেদিন থেকে একদণ্ড এ-বাড়িতে থাকেন না। তিনি একদিকে, আপনি আর

একদিকে। ঘরের মানুষ যদি ঘরে না থাকে, তাহলে কি ভাল লাগে? তামাক দেব কি বাবু?

শ্রীকান্ত। না থাক্।

[রতনের প্রস্থান। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাজ। আজ দেখছি খুব লক্ষ্মী ছেলে! সকাল সকাল ফিরেছ?

শ্রীকান্ত। হুঁ।

রাজ। একি, খুব গম্ভীর যে! আমার আসতে দেরী হয়েছে বলে রাগ করেছ?

শ্রীকান্ত। না, না। রাগ করব কেন?

রাজ। দ্যাখ, তর্কালঙ্কার মশাই বোলছিলেন একটা ব্রতের কথা, কিন্তু একটু কঠিন ব'লে সে ব্রত সবাই নিতে পারে না। আর এত সুবিধাই বা কজনের ভাগ্যে জোটে। তিনদিন একরকম উপোস কোরেই থাকতে হয়। সুনন্দার-ও ভারি ইচ্ছে। দুজনার একসঙ্গেই তা হলেই হয়ে যায়। কিন্তু তোমার মত না হোলে ত আর---

শ্রীকান্ত। আমার মত না হোলে কি হবে?

রাজ। তাহলে হবে না।

শ্রীকান্ত। তা যদি না হয়, তাহলে এ মতলব ত্যাগ কর।

রাজ। যাও তামাসা করতে হবে না।

শ্রীকান্ত। তামাসা নয়—সত্যিই আমার মত নেই।

রাজ। কিন্তু আমি যে সব ঠিক করে এলাম। জিনিস পত্র কিনতে এতক্ষণ বোধ হয় লোকও চলে গেল। কাল সকাল থেকে ব্রত নেব। বাঃ—এখন বারণ কোরলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? ছোট ঠাকুর—, বাঃ, এ কেবল

তোমার চালাকি, আমাকে মিছামিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবে না। তুমি বল তোমার মত আছে।

শ্রীকান্ত। আছে, কিন্তু কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা কর না লক্ষ্মী। আজই বা হঠাৎ মত চেয়ে বসলে কেন?

রাজ। (শ্রীকান্তের পায়ে হাত দিয়া) আর কখন হবে না—এইবারটি শুধু আমাকে হুকুম দাও।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা।

(রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল—মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল)

[ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল তখন সকাল হইয়াছে। পাখীর কলকণ্ঠ ভাসিয়া আসিতেছে]

[তখন সকাল হইয়াছে। দেখা গেল বিছানাটী শূণ্য, ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর খান কয়েক লেখা চিঠি। শ্রীকান্ত ঘরে নাই। অপর দিক দিয়া কুশারী গৃহিনীর সহিত রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল]

রতন। আপনি বসুন মা, বাবু বোধহয় কাছে পিঠেই কোথাও গেছেন, এলেন বলে।

কুশারী গৃহিনী। তোমার মা এত সকালে কোথায় গেছেন রতন?

রতন। আর বলেন কেন? পূবে ফরসা হওয়ার আগেই মা স্নান করে বেরিয়ে পড়েছেন। মা আজ থেকে কি এক ব্রত নিয়েছেন, সকাল থেকে তর্কলঙ্কার মশায়ের বাড়িতে যাগ-যোগ্যি হবে। ব্রত সারা হলে শুনছি ওখান থেকে নাকি মা বক্কেশ্বর যাবেন স্নান করতে।

কুশারী গৃহিনী। কানাঘুষোয় কথাটা শুনেছিলাম বটে। তা যাক্, তোমার বাবু ওখানে যাননি ত?

রতন। না না। ব্রত, উপোস এসব বাবু বড় পছন্দ করেন না। এই নিয়ে প্রায়ই মার সঙ্গে বাবুর খিট্-মিট্ লেগেই আছে।

কুশারী গৃহিণী। তা তোমার বাবু ব্রতে মত দিলেন যে বড়?

রতন। না দিয়ে কি উপায় আছে। ব্রত করার মত না পেলে মা হয়ত পর পর কদিন উপোসই দিতেন।

কুশারী গৃহিণী। তোমার মা বুঝি খুব জেদি?

রতন। না, না—সে সব কিছু নয়। তবে কি জানেন, মার মুখের ওপর কারুর কথা কওয়ার সাধ্যি নেই। মা যদি হুকুম করেন, রতন তোমায় যমের বাড়ি যেতে হবে, তাহলে যেতে হবে—না বলতে পারব না। (সহসা শ্রীকান্তকে দেখিয়া) এই যে, বাবু এসে গিয়েছেন।

[শ্রীকান্ত প্রবেশ করিল। রতন বাহির হইতে যাইবে, শ্রীকান্ত বলিল]

শ্রীকান্ত। রতন, আমার এই চিঠি দুটো ডাকে দিয়ে আসতে হবে।

(রতন চিঠি লইয়া প্রস্থান করিল)

(কুশারী গৃহিনীকে) এই যে, আপনি কতক্ষণ এসেছেন? বসুন।

[কুশারী গৃহিনী একটি মোড়ায় বসিতে বসিতে বলিলেন]

কুশারী গৃহিণী। এই কিছুক্ষণ হোল। মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এসে শুনলাম, তিনি আজ খুব ভোরে আমার দেওরের বাড়িতে গিয়েছেন।

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ। কি এক ব্রত নিয়েছে, তার জন্যে—

কুশারী গৃহিণী। তা ভাল। বার-ব্রত ক'জনের ভাগ্যে হয় বাবা। পয়সাও চাই আবার মনও চাই।

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

[ইতিমধ্যে মহারাজ চা ও জলখাবার দিয়া গেল]

কুশারী গৃহিণী। আজকাল ছোট গিন্নীর সঙ্গে মা লক্ষ্মীর হরিহর আত্মা।

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কুশারী গৃহিণী। আচ্ছা বাবা, তুমিই বল, আমার এই মালক্ষ্মী যে ওর বাড়ি যান, কিন্তু ওকি কোনদিন মানীর মান রাখতে এ বাড়ীতে আসে ?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে না, তা তো আসেননি বটে, তবে আমার মনে হয় সংসারের কাজকর্ম করে আর সময় পান না তাই—

কুশারী গৃহিণী। সময়ের অভাব কি বাবা—অঢেল সময়। ইচ্ছে কোরলে কি আর মনিবের মান রাখতে পারে না। কিন্তু সে মেয়ে সুনন্দা নয়। ও হতভাগির জন্যে আমি কি কম করেছি, কিন্তু তেজ করে চলে যাওয়ার সময় একবারও কি সে কথা ভাবলে ?

শ্রীকান্ত। আমার মনে হয়, আপনি যদি একবার গিয়ে ও-বাড়িতে দাঁড়ান, তা হ'লেই ঝগড়াটা সহজেই মিটে যায়।

কুশারী গৃহিণী। আমি যেচে কেন যাব বাবা ? ওই ওর ভাসুরকে অপমান কোরেছে। ওরই ত উচিত, আমাকে এসে বলা, দিদি, রাগের মাথায় আমি ভুল করেছি, তুমি কিছু মনে কোরো না। আচ্ছা, তাও যদি তোর বোলতে লজ্জা হয়, তাহোলেও তো অন্য রাস্তা খোলা রয়েছে। ছেলেটাকে এতদিনের মধ্যে এক-আধবার পাঠালেও তো যা হোক মিটমাটের একটা পথ হয়ে থাকত।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তা অবশ্য—

কুশারী গৃহিণী। তেজ করে একদিনের জন্যেও ছেলেটাকে পর্য্যন্ত পাঠালে না! তুই না হয় পেটেই ধরেছিস, কিন্তু কোলে পিঠে করে আমি কি ওকে মানুষ করিনি। যে ছেলে একদণ্ড আমায় ছেড়ে থাকতে পারত না, তাকে এমন ভাবে আটকে রাখা, এটা কি উচিত ?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা আপনি যদি বলেন, আমি না হয় এ-বিষয় তর্কালঙ্কার-মশায়কে বলে দেখতে পারি।

কুশারী গৃহিণী। না বাবা। তোমরা মনিব—তোমাদের কথা না রাখলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। ওদের কি আর আজ মান-ইজ্জতের ভয় আছে। নইলে হাটে ব'সে ঠাকুরপো কখনো বেগুণ বেচতে পারে!

শ্রীকান্ত। সে কি? তর্কালঙ্কার-মশাই হাটে ব'সে বেগুন বেচেছেন?

কুশারী গৃহিণী। হ্যাঁ বাবা, শুনলাম কাল না-কি হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুণ বেচেছেন।

শ্রীকান্ত। তিনি অধ্যাপক মানুষ, হঠাৎ বেগুণই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারী গৃহিণী। আর কেন? ঐ হতভাগির জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই না-কি গোটাকয়েক গাছে বেগুণ ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছিল হাটে বেচতে। এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কেমন করে?

শ্রীকান্ত। কিন্তু একে শত্রুতা করা বলছেন কেন? তাঁরা আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিষ বিক্রী করতে গ্যাছেন। তাতে আপনার নালিশ কি?

কুশারী গৃহিণী। (বিহ্বলের মত চাহিয়া) এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই—মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই। আচ্ছা, আমি উঠি।

(প্রস্থানোদ্যত)

[সহসা শ্রীকান্ত বলিল]

শ্রীকান্ত। দেখুন, এর চেয়ে বরং আপনার মনিব ঠাকুরুণকে সব জানাবেন। তিনি হয়ত আপনার সকল কথা বুঝতে

পারবেন, এবং প্রয়োজন হোলে আপনার উপকারও করতে পারবেন।

কুশারী গৃহিণী। আর আমি কাউকে বোলতেও চাই নে, আর আমার উপকার কোরেও কাজ নেই।

(আঁচলে চোখ মুছিল)

শ্রীকান্ত। তা এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তারা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোন প্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারী গৃহিণী। (কপালে করাঘাত করে) পোড়া কপাল! তা হোলেও ত একটা উপায় হোত।

[সহসা রাজলক্ষ্মী, সুনন্দা ও বিনুকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল—সঙ্গে যদুনাথ তর্কালঙ্কার]

রাজ। চল বাবা—

[তাহাদের দেখিয়া কুশারী গৃহিণী থতমত খাইয়া বলিলেন]

কুশারী গৃহিণী। এই, আপনার খোঁজেই এসেছিলাম মা।

রাজ। আমিও আপনার খোঁজেই এসেছি। নায়েবমশায়ের কাছে শুনলাম, আমার খোঁজে আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য এলাম, চলুন।

কুশারী গৃহিণী। (আশ্চর্য্য ভাবে) কোথায়?

রাজ। আপনার দেওরের বাড়ি।

কুশারী গৃহিণী। আপনি কিছু মনে করবেন না মা, ছেলের দিব্যি দিয়ে যে, ছেলেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তার বাড়িতে আমি যেতে পারব না।

রাজ। কিন্তু আপনাকে এযো করবো বোলে যে আমি নিতে এলাম। কুশারী মশাই নিজেই আপনার দেওরের বাড়িতে গেছেন, সমস্ত কাজ তদারকও করছেন।

শ্রীকান্ত। আপনি আর অভিমান করে থাকবেন না—যান—

কুশারী গৃহিণী। কিন্তু (সুনন্দাকে দেখাইয়া) ও যে ছেলের দিব্যি দিয়েছে বাবা। সে দিব্যি ফিরিয়ে না নিলে—

সুনন্দা। আমি সে দিব্যি ফিরিয়ে নিচ্ছি দিদি। যা নিয়ে আমাদের বিরোধ, সেই কানাই বসাকের বৌয়ের সম্পত্তি (রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া) উনি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কোরেছেন। চলুন—

তর্কালঙ্কার। চল বৌঠান্। আমরা ভায়ে ভায়ে যখন বিরোধটা মিটিয়ে নিয়েছি তখন তোমরা বৌয়ে বৌয়ে আর—

শ্রীকান্ত। ঠিকই ত! যান—

[ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী বিনুকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল]

রাজ। চলুন, বিনু যে আপনাকে নিতে এসেছে।

বিনু। এসেছিই ত। চল না বড়মা—

কুশারী গৃহিণী। যাব, যাব বৈকি বাবা। তুমি আমায় নিতে এসেছো—আর কি আমি অভিমান করে থাকতে পারি? মনিবকে নালিশ জানাতে এসেছিলাম, এসে দেখলাম আজ নালিশের দিন নয়—ব্রত গ্রহণের দিন নয়—আজ ব্রত উদ্‌যাপনের দিন—আজ ব্রত উদ্‌যাপনের দিন।

[কুশারী গৃহিনীর বুকের মাঝে বিনু। চোখে অশ্রু। একদিকে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত অপরদিকে সুনন্দা ও তর্কালঙ্কার—সকলের চোখে-মুখে তৃপ্তির ছায়া পরিস্ফুট]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্রীকান্তর দেশের বাড়ি। অপরাহ্ন কাল। ঠাকুর্দ্দার ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একটি চৌকির ওপর মাদুর বিছানো। দেওয়ালে কয়েকটি কালিঘাটের পট চিত্র। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝোলান একটি বাঁশের আলনায় জামা কাপড়—

যবনিকা উত্তোলিত হইতে দেখা গেল—ঘরে কেহ কোথাও নাই। ঠাকুরদার সহিত শ্রীকান্ত কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠাকুরদার গায়ে একটি পিরাণ, হাতে একটি থেলো হুঁকা। তিনি তামাক টানিতে টানিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন, পিছনে শ্রীকান্ত]

ঠাকুর্দা। একেই বলে যোগাযোগ। হেঁ-হেঁ-হেঁ— বস ভায়া, বস। (শ্রীকান্ত ও ঠাকুর্দা চৌকিতে উপবেশন করিলেন) দেশ থেকে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুরুণটির সঙ্গে সেই যে চলে গেলে ভায়া, তারপর আব তোমার কোন খবরই পাইনি। তোমার রাঙাদিদি তো ভেবে চিন্তে, কেঁদে-কেটে অস্থির। রক্তের-টান ভায়া, রক্তের-টান। নইলে পথের মাঝে হঠাৎই বা এমন কোরে দেখা

রাঙা। ‘ব কেন।

কুশারী গৃ৷

[সহসা রাঙাদিদির প্রবেশ]

দিয়ে যে‚ই যে গো ! এসো। তোমার নাতির সঙ্গে সেই অসুখ বাড়িতে ্য যাওয়ার গল্প বলছিলাম।

রাঙাদিদি। বাদ দাও ও পুরোণো কথা। সে কথা মনে হ'লে আজও আমার গা রী-রী কোরে জ্বলে যায়। ছুঁড়ী যেন এসে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। একবার চোখে দেখতে পর্য্যন্ত দিলে না।

ঠাকুর্দা। তাই ত বোলছিলাম গো। নিযে গেলে কি হবে? এ তো আর পাতানো সম্পর্ক নয—রক্তের-টান। সে টানে ফিরে আবার একদিন আসতেই হবে।

রাঙাদি। তা যা বলেছো। নইলে, পথের মাঝেই বা দেখা হবে কেন?

ঠাকুর্দা। দেখা কি আর সাধে হয়েছিল গো! ভায়া আমার ভাগ্যিস দেড়া-গাড়ীতে ছিল! ভীড় কম, তাই তোমার নজরে পড়ল। নইলে কি আর খুঁজে পেতাম গিন্নী—হেঁ-হেঁ-হেঁ—

রাঙাদি। তা যা বলেছ! নইলে, নাতি যাচ্ছিল কাশী থেকে কোলকাতা, আমরা আসছিলাম গয়া থেকে দেশে। ভাগ্যিস থার্ড কেলাসে ভীড় ছিল, নইলে তো আমরা দেড়া গাড়ীতে উঠতাম না।

ঠাকুর্দা। ভাগ্য—ভাগ্য!

শ্রীকান্ত। কিন্তু ভাগ্যটা যে কার ঠাকুর্দা, এতক্ষণ সেইটাই তো আমি বুঝতে পাচ্ছিনি। আপনাদের না আমার?

ঠাকুর্দা। তোমারই বোলতে হবে ভায়া। নইলে কি আর এমন যোগাযোগ হয়?

রাঙাদি। সবই ভবিতব্য। মজা দেখেছ? কে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেছে, আগে থাকতে কারুর বলবার যো নেই।

শ্রীকান্ত। মানে?

রাঙাদি। নইলে আমার বড় বোন, তাঁর নাতনী পুঁটুর বর খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হোয়ে, শেষে কিনা আমার সঙ্গে পুঁটুকে পাঠিয়ে দিল!

ঠাকুর্দা। আবার তাও বলি, সেই দিনই পথের মাঝে সঙ্গে সঙ্গে বরের সন্ধান মিলল।

শ্রীকান্ত। সে কি ঠাকুর্দা! আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া সত্যিই স্থির করেছেন না-কি?

ঠাকুর্দা। হ্যাঁ, সত্যি। শোন কথা একবার—

রাঙাদি। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার মা? তোর ঠাকুরদার তো ইচ্ছে আসছে বোশেখ মাসেই শুভ কাজটা সেরে ফেলেন।

শ্রীকান্ত। বোশেখ মাসেই?

রাঙাদি। এর মধ্যে পুঁটুর যে যেখানে আছে আনিয়ে নেওয়া যাবে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমি তো এখন কিছু স্থির করিনি।

রাঙাদি। বুঝেছি, দো-মনা করছিস্। ভাবছিস্, মেয়ে নেকা-পড়া জানে কি না? সে ভয় নেহ, পুঁটু আমাদের ভালই নেকা-পড়া জানে। ও এমন গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, তোদের আজ-কালকার নাটক নভেল হার মেনে যায়। না গো? সেই ওবাড়ির নন্দরাণীকে এমনি একখানা চিঠি লিখে দিয়েছিল যে, সাতদিনের দিন জামাই পনেরোদিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

শ্রীকান্ত। না, না, সে সবের জন্যে নয়, আমি ভাবছি—

ঠাকুর্দা। ও ভাবাভাবির আর সময় নেই ভায়া। শোন, মেয়ের বয়স বারো-তেরোই বলি আর যাই বলি, আসলে ওর বয়স হোল সতেরো-আঠেরো—গাঁয়ের মধ্যে ঢি ঢি পড়ে গেছে তোমার সঙ্গে পুঁটুর বিয়ে হচ্ছে। এর পরে তুমি পেছোলে ও-মেয়ের আমরা বিয়ে দেব কেমন করে?

শ্রীকান্ত। কিন্তু ঢি ঢি করার জন্যে তো আমি দায়ী নই।

ঠাকুর্দা। তা হোলে বোলতে চাও, কথাটা চাউর করার জন্যে আমরাই দায়ী?

শ্রীকান্ত। কে দায়ী—আমি জানিনা। কিন্তু পুঁটুকে বিয়ে করার কল্পনা আমার আগেও ছিলনা, এখনও নেই। আমার অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এখন দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার মতন।

ঠাকুর্দা। পাঁচ-সাতদিন হোল আমরা গয়া থেকে এসেছি। একথা এখন না বলে, আর দুদিন আগে বোললেই হোত।

শ্রীকান্ত। আজকে যে ভাবে কথাটা পাড়লেন, কদিন আগে যদি এই ভাবে কথাটা পাড়তেন তা হলে অবশ্যই বলতাম।

ঠাকুর্দা। তা হোলে বলতে চাও সব দোষ আমার ?

শ্রীকান্ত। আপনাদের কাউকেই দোষী করতে চাই না। মাঝ থেকে আমি কি কোরে দোষী হয়ে গেলাম তারই কিনারা করতে পারছি না।

[সহসা রাঙাদিদি শ্রীকান্তর হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন]

রাঙাদি। আমার মুখ চেয়ে যে কোরেই হোক কিনারা তোমায় কোরতেই হবে ভাই। নইলে মেয়েটার মা-বাবার কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব না।

শ্রীকান্ত। তোমাদের কাছে কোন কথা দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয় রাঙাদি। এ বিষয়ে মত দেওয়ার আগে আমার এক-জনের কাছে মত নেওয়া দরকার।

ঠাকুর্দা। বেশ ভাল কথা। তাকে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে বোলো ভাই, যেন তিনি অমত না করেন।

শ্রীকান্ত। আমি আজ কোলকাতায় যাচ্ছি, যা হয় আপনাদের চিঠি দিয়ে জানাব।

রাঙাদি। কোলকাতায় গেলে কি আর আমাদের কথা মনে থাকবে ভাই ?

ঠাকুর্দা। তা যা বলেছ!

শ্রীকান্ত। চিঠির উপর যদি আপনারা ভরসা কোরতে না পারেন, তা হ'লে আমার বাসার ঠিকানা আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে না হয় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ঠাকুর্দা। বেশ! সেই ভাল, ঠিকানাটা লিখে দাও।

শ্রীকান্ত। (ঠিকানা লিখিযা) এই নিন ঠিকানা।

ঠাকুর্দা। তা হ'লে কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

শ্রীকান্ত। পাঁচ-ছদিন পরেই যাবেন।

ঠাকুর্দা। বেশ! সেই ভাল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মুরারীপুরের আখড়া। তখন সন্ধ্যা। আখড়ার সম্মুখস্থ দাওযায় তখন কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মধ্যস্থলে একটি মঞ্চে গোবিন্দজীউর যুগল মূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপ-ধুনার ধোঁয়ায় ঘরটী সমাচ্ছন্ন। মধ্যস্থলে দ্বারিকদাস বাবাজী। লোকটী শ্যামবর্ণ—রোগা দীর্ঘকায়। মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। গোঁফ দাড়ী প্রচুর নয় সামান্যই—বয়স পৌইত্রিশ-ছত্রিশ-এর মধ্যে। তাঁহার নিকটে আরও কয়েকজন বৈষ্ণব বাবাজী বসিয়া আছেন। ইহার মধ্যে কেহ বা মধ্যবয়স্ক, কেহ বা অল্পবয়স্ক, কেহ বা বৃদ্ধ। একজন খোল, একজন করতাল বাজাইতেছিল। মধ্যস্থলে কমললতাকে দেখা গেল। গেরোদিয়া চুল পিঠের উপর ঝুলিতেছে। হাতে

কয়েকগাছি চুড়ি। গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যে তুলসীর জপমালা, ছাপ ছোপের খুব বেশী আড়ম্বর নাই। ইহাদের মধ্যে আরও কয়েকজন বৈষ্ণবীকে দেখা গেল। পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। ইহাদের সকলের বেশ-বিন্যাস কমললতারই মত। কমললতা কীর্ত্তন গাইতেছিল। তাহার গানের প্রতিটী কলি লইয়া অপরাপর বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা দোয়ার দিতেছিল। বৈষ্ণবীদের মধ্যে কেহ কেহ এক একটি লাইন একাই গাহিতেছিল। সেই লাইনটী লইয়া কমললতা সুরের জাল বিস্তার করিতেছিল। দ্বারিকদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবেরা ভাব সমাধিস্থ অবস্থায় সে রস উপভোগ করিতেছিল]

[কমললতার গান]

কি বলিব সখি দুই আঁখি দিয়ে বিধি হোল মোর বাম
শত আঁখিতেও মেটে নাক সাধ এমনি আমার শ্যাম।
শ্যাম কিশলয় শোভন সে তনু যেন যে তমাল শাখী
সাধ হয় সখি, সে তনু ঘিরিয়া আমারে জড়ায়ে রাখি।
সে দুটী নয়ন যুগল ভ্রমর উড়িয়া আসিতে চায়—
যুবতীর চোখে সে আঁখি লাগিলে, পরাণ হারায়ে যায়।
দিশি দিশি ভরি রয়েছে আমার নয়ন মোহন শ্যাম
আমার অন্তর বাহিরে লেখা আছে সখি
আমারই কৃষ্ণনাম।

[কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে গোবিন্দজীউকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দ্বারিকদাস বলিলেন]

দ্বারিকদাস। কমল!

কমললতা। বড় গোসাই।

দ্বারিক। এর মধ্যে গহর গোঁসাই আর আসেনি না?

কমল। না।

দ্বারিক। গহর গোঁসাই এখানে আসা হঠাৎ বন্ধ করলে কেন বল ত?

কমল। আমার মনে হয় ওদের সমাজের চাপেই এবার গহর গোঁসাই এখানে আসা বন্ধ করেছে। নইলে প্রতিটী সন্ধ্যায় যে কীর্ত্তন শুনতে আসতো, সে আজ এ কদিনের মধ্যে একবারও এলো না?

দ্বারিক। তোমার অনুমানও ঠিক হতে পারে, আবার হয় ত অসুখে পড়ে আছে তাও হতে পারে। যাই হোক কাল তার একবার খবরটা নিতে হয় কমল। আত্মভোলা কবি মানুষ। বলা যায় না, খোঁজ না নিলে আমাদের ওপর অভিমানও করতে পারে।

[সহসা অদূরে গহরের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল]

কমল। (উৎফুল্লভাবে) ঐ যে, গহর গোঁসাই।

দ্বারিক। চুপ চুপ, কমল! কদিন বাদে গহর গোঁসাই আসছে। চুপ চুপ!

[উভয়েই ভাব সমাধিস্থ হইলেন। গহর গোঁসাই গাহিতে গাহিতে উঠানে প্রবেশ করিলেন। সেও ভাবে বিভোর]

[গহরের গান]

আমি তোমার বাঁশী শুনেছিলাম
প্রেম যমুনার পারে।
তাই সুরের রসে রসিয়ে নিলাম
এক তারারে ॥
পেয়েছি কুলের বাধা, শুনেছি মাটীর কাঁদা
তুমি যে রাধা রাধা রাধা বলে—
ঘুচিয়ে দিলে সব বাধারে।
আমি যে ঘর ছেড়েছি পথের টানে
চোখ গেল গো তার ধূলাতে—
আমায় অন্ধ করে পারবে নাকো আর ভুলাতে
আমি তোমার নামে ভাসিয়ে তরী—
গুনে দিলাম প্রেমের কড়ি
তোমায় নিয়ে ডুব্‌বো আমি জানি (এবার)
(তোমায় নিয়ে ডুব্‌বো আমি) দেখি তুমি ডুবাও কারে ॥

[গীতান্তে উঠানের তুলসী মঞ্চের অদূরে সে
বসিয়া পড়িল দ্বারিকদাস বলিলেন]

দ্বারিক। গহর গোঁসাই। একদিন তুমি না আসায় আমরা বন্ধু-বিরহে বড়ই কাতর হোয়ে পড়েছিলাম। আজ ক'দিন পরে তোমার কণ্ঠসুধা দিয়ে তুমি আবার আমায় কিনলে।

গহর। আল্লার কেনা গোলাম আমি। কেনার অধিকার আমার নেই গোঁসাই। দুনিয়ার হাটে খোদার গোলাম এই কথা যেন মুক্তকণ্ঠে প্রচার কোরে যেতে পারি।

দ্বারিকা। পারবে—পারবে, তুমি নিশ্চই পারবে। সাধনার পথে তুমি যে অভিমান-শূন্য।

কমল। এখন তাই মনে হচ্ছে বড় গোঁসাই। গহর গোঁসাই আমাদের এখানে কদিন না আসায় মনে হোয়েছিল, বুঝিবা আমাদের ওপর অভিমান কবেই—

গহর। অভিমান কোরে নয় কমল, বহুদিন পরে এক অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুকে পেয়ে এখানে আর আসতে পারিনি। পাঠশালায় আমরা একসঙ্গে পড়তাম। সত্যি বোলছি গোঁসাই, কদিন পরে বন্ধুর বিরহ-ব্যথা আজ আমাকে বড়ই কাতর কোরে তুলেছে।

কমল। ও! আজ বুঝি তোমার বন্ধুটী চলে গেলেন গহর গোঁসাই?

গহর। হ্যাঁ, তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সোজা তোমাদের এখানে চলে আসছি। দিন সাতেক আগে হঠাৎ তার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা। বহুকাল পরে দেশে এসেছিল। বর্মাতে চাকরী করে।

কমল। তোমার স্বজাতি?

গহর। না, ব্রাহ্মণ।

কমল। ব্রাহ্মণ! তোমার বাড়িতে ছ-সাতদিন কাটালো—সাহস তো কম না—

গহর। কি জান কমল? আমার মত সংসারে সেও একা। তাই তার ভয়ও নেই—ভাবনাও নেই।

কমল। এ ক'দিন তাহলে তোমাদের বেশ কেটে গেছে বল?

গহর। হ্যাঁ। গান—গল্প, কাব্য, সাহিত্য, এ ক'দিন আলোচনার আর কিছু বাকি ছিল না। জান বড় গোঁসাই? কথা প্রসঙ্গে বোললে, রক্ত মাংসে গড়া মানুষের মধ্যে আছে কি? মনের মধ্যেই তো মকরন্দ, সেখানে মধু যত হুলও তত। হুলের বিষ নষ্ট কোরতে পারে শুধু মনের বল। এ বল যার নেই, মধুর আস্বাদ সে জীবনেও পাবে না।

দ্বারিক। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে গহর গোঁসাই, তোমার বন্ধুটী জীবনে অনেক কাঁটার বন পেরিয়ে লক্ষ্যের পথে ছুটে চলেছেন।

গহর। ঠিক বলেছ গোঁসাই। শ্রীকান্ত ঠিক এই ধরণেরই মানুষ।

কমল। তোমার বন্ধুটীর কি নাম বোললে গহর গোঁসাই?

গহর। শ্রীকান্ত।

কমল। আহা—বেশ নামটী তো!

দ্বারিক। তোমার বন্ধু আবার যদি কখনো আসে, তা'হলে আখড়ায় তাকে নিয়ে এসো, আলাপ করা যাবে।

গহর। বেশ তো। উপস্থিত সে কোলকাতায় গেছে। বর্মায় যাবার আগে তাকে অনেক করে বলেছি আর একবার দেখা দিয়ে যেতে। সে যদি আসে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে নিয়ে আসব গোঁসাই।

কমল। আনবে?

গহর। হ্যাঁ হ্যাঁ আনব--নিশ্চয়ই আনব।

তৃতীয় দৃশ্য

[কলিকাতায় শ্রীকান্তর মেসের একটী ঘর। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে কেহ নাই। মেসের চাকর ঘরে একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়া দিল, ইতিমধ্যে রতন আসিয়া বলিল]

রতন। কি গো, বাবু এসেছেন?

চাকর। না।

রতন। আজও আসেন নি!

চাকর। না, তুমি তো কদিনই ঘোরাঘুরি করছ ?

রতন। কি করি বলো ?

চাকর। এদিকে বাবুর তো আসার ঠিক নেই। তা তোমার যা বলবার আছে আমায় বলে যাও। আমি এলে বলব।

রতন। দূর বাপু! তোমায় বললেই যদি হোত, তবে রোজ আসব কেন ?

চাকর। তবে বস।

(প্রস্থান)

[ইতি মধ্যে ঘরের পিছনের বারান্দা দিয়া শ্রীকান্তকে প্রবেশ করতে দেখা গেল। তাহার পদশব্দে রতন সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

রতন। এই যে বাবু, এলেন ?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে রতন ?

রতন। আজ্ঞে, ব্যাপারটা খুব জরুরী। নইলে মা কি কাশী থেকে অমন ব্যস্ত হোয়ে কোলকাতায় চলে আসেন ?

শ্রীকান্ত। কাশী থেকে তোমার মা এসেছেন! কোথায় তিনি ?

রতন। আজ্ঞে শ্যামবাজারে মা বাড়ি কিনেছেন যে—আমরা আজ ক'দিন হোল কোলকাতায় এসেছি।

শ্রীকান্ত। তাই নাকি ? তা তোমার মা হঠাৎ কোলকাতায় বাড়ি কিনলেন যে ?

রতন। কি কোরে জানব বলুন ? মার মনের খবর কি আর জানবার উপায় আছে ? তবে বঙ্কুবাবু এখন ব্যাঁকাট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে—এই সবের জন্যেই বোধ হয়—

শ্রীকান্ত। বল কি রতন ? যাকে ছেলের মতন কোরে মানুষ কোরলেন, শেষে সেই কিনা আজ—

রতন। বাবু, পেটের ছেলেরাই আজকাল মাকে মানে না, আর এ তো সতীন-পো। মার পয়সায় লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে বঙ্কুবাবু এখন বোধহয় ভাবছেন কিসের জন্য আর পর-বশে থাকা? দান-পত্রের জোরে মেরে তো সব নিয়েছেন।

শ্রীকান্ত। তা যা বলেছ।

রতন। কিন্তু বাবু, সে কতক্ষণ? বলি ধর্ম্ম বোলে তো একটা জিনিস আছে?

শ্রীকান্ত। সে তো বটেই।

রতন। তাই তো, বঙ্কুবাবুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি ভাবি, এ আর বেশী দিন নয়, মা-লক্ষ্মী টল্‌লেন বোলে। মা যখন দেন, দু'হাতে ঢেলে দেন, বঙ্কুবাবুকেও দিয়েছেন। তাই ও ভেবেছে নিংড়ান মৌচাকের আর দাম কি? বড় জোর এখন জ্বালানই চলে। কিন্তু ও জানে না, আজও মায়ের এক একখানা গয়না বিক্রী কোরলে, অমন পাঁচখানা বাড়ী তৈরী হয়।

শ্রীকান্ত। তাই না কি! কিন্তু সে সব আছে কোথায়?

রতন। আছে বাবু আছে, মার কাছে আছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়ে সমস্ত উজোড় করে দিয়ে ভিখিরী হোতে পারেন, কিন্তু আর কারো জন্যে নয়। বঙ্কুবাবু জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর আর চাকরের ভাবনা ভাবতে হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি কোরে চলে আসায় যে মার বুকে কি শেল বিঁধেছে বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে!

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় কোরেছেন, এ খবর তো তুমি জান রতন।

রতন। (জিভ কাটিয়া) আমরা চাকর বাবু। এসব কথা আমাদের

কানেও শুনতে নেই। মিথ্যে মিথ্যে, ও সব মিথ্যে। আজ ক'দিন আপনার এখানে আনা গোনা করছি। রাত হয়ে যাচ্ছে— চলুন বাবু। মা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।

শ্রীকান্ত। চল।

(শ্রীকান্ত ও রতন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

[কলিকাতা, রাজলক্ষ্মীর বাড়ি—দোতলায় বারান্দা-সংলগ্ন একখানি বড় ঘর। ঘরটী গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার ওপর ফুলকাটা জাজিম ও গোটাদুই তাকিয়া। অদূরে জরির কাজ করা মখমলের চটি, পাশে গুড়গুড়ি, একপাশে খাট। খাটের ওপর বিছানা পাতা। একধারে আলনায় সাজানো কয়েকটী জামা-কাপড়। ঘরের ভিতর রাজলক্ষ্মীকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত দেখা গেল। পরণে আট-পৌরে সাধারণ মিলের সাড়ী, গায়ে কয়েকখানি গয়না, মাথার আঁচলে পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশে-পাশে ঝুলিতেছে]

রাজলক্ষ্মী। মহারাজ—মহারাজ!

মহারাজ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই মা।

[রাজলক্ষ্মী যথারীতি গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে মহারাজ প্রবেশ করিয়া বলিল]

মহারাজ। মা, আমায় ডাকছিলেন?

রাজ। হ্যাঁ, তোমার সব রান্না হোয়ে গেল ?

মহারাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ মা।

রাজ। ময়দা মেখে রাখো, বাবু যদি আসেন খানকতক লুচি ভেজে দেবে।

মহারাজ। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

[রাজলক্ষ্মী পুনরায় গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। সহসা নেপথ্যে রতনের গলা শোনা গেল]

রতন। (নেপথ্যে) মা! বাবু এসেছেন। যান্ বাবু যান্, এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরের ঘর।

[কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীকান্ত ঘরে প্রবেশ করিল, রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে একবার চাহিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

শ্রীকান্ত। কি ব্যাপার? কোলকাতায় হঠাৎ চলে এলে যে ?

রাজ। সে কথা পরে বোলছি।

শ্রীকান্ত। পরে না বোললেও চলবে, রতনের কাছ থেকে কিছু কিছু আমি শুনেছি। দানপত্র করার আগে সেইজন্য তখন তোমায় বোলেছিলাম, লক্ষ্মী নিজের সর্ব্বস্ব এমন কোরে বিলিয়ে দিয়ো না। শেষে বন্ধু যদি তোমায় না দেখে? কিন্তু আমার কথা তখন তুমি শুনলে না।

রাজ। তার জন্য কোলকাতায় আমি ছুটে আসিনি। এসেছি তোমার জন্যে।

শ্রীকান্ত। আমার জন্যে ?

রাজ। হ্যাঁ, আমার মতামত জানার জন্য দেশের বাড়ী থেকে তুমি আমায় যে চিঠি লিখেছিলে, সেটা অন্ততঃ একশোবার পড়েছি। তার উত্তরও একটা লিখেছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, চিঠি দিয়ে মতামতটা না জানিয়ে, বরং সামনা-সামনি তা প্রকাশ করাই ভাল। তুমি জান না, এই অজানা জায়গায় এ ক'দিন আমার কি ভাবে কাটছে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি যে, তুমি হঠাৎ চলে আসবে।

লক্ষ্মী। নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমাকে এমনভাবে চলে আসতে হোল। পুঁটুকে বিয়ে করার সম্বন্ধে তুমি আমার মতামত জানতে চেয়েছ। এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করবে, এজন্য আমি কোনদিন প্রস্তুত ছিলাম না।

শ্রীকান্ত। আমিও না। তুমি বিশ্বাস কর লক্ষ্মী, শুনেছি দশচক্রে একদিন নাকি ভগবান ভূত হয়েছিল—এ কথা কতদূর সত্যি আমি জানি না। কিন্তু আমার জীবনে আমি প্রত্যক্ষ কোরলাম পুঁটুর সঙ্গে আমার এই বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপার নিয়ে।

রাজ। কি রকম ?

শ্রীকান্ত। কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা কোরে কোলকাতায় ফিরছি, গয়া ষ্টেশনে হঠাৎ ঠাকুর্দা আর রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা, সঙ্গে পুঁটুরাণী। যেহেতু আমি অবিবাহিত, সেহেতু ঠাকুর্দা আর রাঙাদি স্থির করলেন, পুঁটুরাণীর সঙ্গে তাঁরা আমার বিয়ে দেবেন। শেষে ব্যাপারটা যখন অত্যন্ত চরমে পৌছল, তখন বোলতে বাধ্য হলাম এ-ব্যাপারে আমার একজনের মত নেওয়ার দরকার।

রাজ। শোন, নির্লজ্জের মত এ-বিষয়ে আমার সম্মতি দেওয়া বা অসম্মতি প্রকাশ করা কোনটাই উচিত হবে না। তুমি মনে কোরো

না, হঠাৎ আমি তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তোমাকে আমি কুড়িয়ে পাইনি, পেয়েছিলাম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। দুটো মন্তর-পড়া বন্ধন না থাকলেও বিদায় দেবার কর্তা তুমি নও। আমাকে ত্যাগ করার মালিকানার স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই। গঙ্গামাটীতে মধু ডোমের মেয়ের বিয়ের কথা আমি ভুলিনি, সেদিন তুমিই বলেছিলে, মন্ত্র যাই হোক্, ঐ মন্ত্রের জোরেই তো ওদের মিলন পুরুষানুক্রমে অটুট আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমার মতামতের অপেক্ষা না করে তুমিই ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দিতে পারতে।

শ্রীকান্ত। সেই চরম মুহূর্ত্তে, সে কথা স্পষ্ট করে জানানো সম্ভব হয়নি বোলেই তো তোমায় চিঠি দিয়েছিলাম।

রাজ। ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমায় বরণ কোরেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বেয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙামালার সে রাঙা রঙ তুমি চিনতে পারনি। বাঙালীর ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার কোরে দিয়েও সেই মধুর স্মৃতিকে আজও আমি ভুলিনি। বঙ্কু বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে। বলতে পার, তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে আমি বার হব কোন্ মুখে? এ অসম্মানই বা সইবো কি কোরে? যদি কখন অসুখে পড়, দেখবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরে আসব বাইরে থেকে তোমার বাড়ির চাকরের মুখে খবর শুনে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বল নাকি?

শ্রীকান্ত। এ প্রসঙ্গ তুলে তুমি আর আমায় লজ্জা দিও না লক্ষ্মী। আমার চিঠির উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

রাজ। সে প্রশ্নের পুরো জবাব এখনও তুমি পাওনি। আমার আজকের কথা শুনে তুমি হয়তো বোলতে পার, তবে কি এমনি

নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে আমি চিরদিন কাটাব? এর পরে এমন প্রশ্ন যদি তোমার মনে জাগে, সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, তো আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না। তুমি ভাব গুরুদেব আমাকে দিয়েছেন মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছেন পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছ ভার বোঝা—এমনি অন্ধ তোমরা। (কাঁদিয়া ফেলিল)

শ্রীকান্ত। (সস্নেহে) লক্ষ্মী!

রাজ। তোমাকে তো ফিরে পেয়েছিলাম আমার তেইশ বছর বয়সে। কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা ভাবতে পার না! গঙ্গামাটীতে সুনন্দার বাড়ি থেকে ব্রত সেরে তীর্থ করতে গেলাম বক্রেশ্বরে, ফিরে এসে দেখলাম তুমি নেই। অভিমান কোরে কোথায় চলে গেছ। তারপর তুমি ফিরে এলে, আমি গঙ্গামাটী থেকে কাশী চলে এলাম। তুমি চলে গেলে কোলকাতা। ক'দিন পরে কোলকাতা থেকে একবার চোখের দেখা দিতে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্যে কাশীতে গেলে, কিন্তু আমার অন্তরের কথা তুমি বুঝতে পারলে না।

শ্রীকান্ত। কাশীতে গিয়ে তোমায় দেখে আমার মনে হোল তোমার সাধনার পথে আর বাধা হব না। তাই সেদিন আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম লক্ষ্মী। দেখলুম, তোমার পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশি আর নেই, নিরাভরণ দেহে ধবধবে একখানা সাদা থান জড়ানো।

রাজ। ও-বেশে আমায় দেখেছিলে কেন, জান? ভেবেছিলাম জলের ধারা গেছে কাদায় গুলিয়ে, তাকে নির্ম্মল আমাকে কোরতেই হবে। কিন্তু তার উৎসই যদি আজ শুকিয়ে যায়, তাহলে থাকল আমার জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা, থাকল সুনন্দা, থাকল আমার গুরুদেব।

শ্রীকান্ত। লক্ষ্মী এমন কোরে জানার সুযোগ তুমি আমায় কোনদিন দাওনি। আজ যখন সে সুযোগ তুমি আমায় দিয়েছ, তখন তার অমর্য্যাদা আমি কখনই কোরব না, কখনই কোরব না।

পঞ্চম দৃশ্য

[শ্রীকান্তর মেসের ঘর। তখন সকাল—প্রসন্ন ঠাকুরদা শ্রীকান্তের শয্যার উপর বসিয়াছিল, পার্শ্বে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে ঠাকুরদা হুঁকা কলিকা বাহির করিতেছিলেন, জানালার নিকট পুঁটুরাণী সবিস্ময়ে বিরাট সহরের বহু বিচিত্র যান-বাহনের দিকে তাকাইয়া ছিল। বারান্দা দিয়া সহসা মেসের চাকরকে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরদা বলিলেন]

ঠাকুদা। ওহে বাপু! শোন—শোন! একটু তামাক সেজে দাও না।

চাকর। আজ্ঞে, এখন কি আর আমার তামাক সাজার সময় বাবু? অফিসের বাবুরা সব সাড়ে-নটায় খেয়ে বেরিয়ে যাবেন। এ সময় ত তামাক সাজা দূরের কথা, আমার মরবার সময় নেই বাবু।

(প্রস্থান)

পুঁটু। আমি তামাক সেজে দেব দাদু?

ঠাকুর্দা। না দিদি, তোমাকে দিয়ে কি তামাক সাজাতে পারি? এখন যদি হঠাৎ শ্রীকান্ত এসে পড়ে, তাহলে যে সে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না ভাই। তার চেয়ে বরং ঐ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখগে যাও, কত গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন যাচ্ছে।

[পুঁটু ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীকান্ত প্রবেশ করিল, সঙ্গে রতন]

ঠাকুর্দা। এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভাল তো ?

শ্রীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল। (ঠাকুর্দাকে প্রণাম করিল)

ঠাকুর্দা। ওরে পুঁটু গেলি কোথায় ? ও পুঁটু !

[ঠাকুর্দার ডাকে পুঁটু জানালার কাছ থেকে এসে শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল]

ঠাকুর্দা। বুঝলে ভায়া, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশায় হাকিম, পাঁচশো টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হোয়ে এসেছে। ঘর-সংসার ফেলে পিসির বার হবার যো নেই—তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম। বোললুম, পরের হাতে তুলে দেওযার আগে, ওকে একবার দেখিয়ে আনি। ওর দিদিমা আশীর্ব্বাদ কোরে বোললে, পুঁটী, এমনি অদেষ্ট যেন তোর হয়। (সহসা রতনের দিকে নজর পড়িতেই) ওহে, তামাকটা বার কোরে দিচ্ছি, একটু সেজে দাও তো বাবা, অনেকক্ষণ তামাক খাইনি।

রতন। আজ্ঞে তা দিন, সেজে দিই।

[ঠাকুর্দা হুঁকো, কল্‌কে, তামাক রতনের হাতে দিলেন, রতন তাহা লইয়া ঘরের বাহিরে গেল]

ঠাকুর্দা। আমি কিন্তু পুটুর পিসেমশাইকে সহজে ছাড়ছি না ভায়া। হাকিমই হোন আর যাই হোন, আত্মীয় তো। দাঁড়িয়ে থেকে কাজটী সমাধা কোরে দিতে হবে তবে তার ছুটী। জানোই তো দাদা, শুভ কর্মে বহু বিঘ্ন। শাস্ত্রে বলে, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে, কারুর আর টুঁ শব্দটী করার যো থাকবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে তো বিশ্বাস নেই, ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কি না—ওদের রাশই আলাদা।

[ইতিমধ্যে রতনের তামাক সাজা হইয়া গিয়াছিল, সে হুঁকা কল্‌কে ঠাকুদার হাতে তুলিয়া দিল এবং তামাক ও টিকার একটী বড় কৌটা ঠাকুদার পাশে রাখিয়া দিল]

ঠাকুদা। ওটা আর পাশে রাখছ কেন বাবু? অমনি ব্যাগে তুলে দাও।

রতন। মাপ কোরবেন বাবু। ও ব্যাগে-ট্যাগে আমি হাত দিতে পারব না।

ঠাকুদা। ও পুঁটি! টিকে তামাকের কৌটটা তুও অমনি ব্যাগে পুরে ফেল্।

[পুঁটি কৌটটী ব্যাগে তুলিয়া রাখিল, এবং পুনরায় বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। ঠাকুদা রতনকে বলিল]

ঠাকুদা। তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছেন বৈকি। দেশের বাড়িতে বাবুর অসুখের সময়।

ঠাকুর্দা। ও তাইতো বলি, চেনা মুখ।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ। (প্রস্থান)

ঠাকুর্দা। (বার দুই তামাক টানিয়া) বুঝলে ভায়া, বেরুবার সময় দিনটা দেখেই এসেছিলুম। বেশ ভাল দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্ব্বাদের কাজটা অমনি সেরে যাই। নোতুন বাজারে সমস্ত জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না?

শ্রীকান্ত। না।

ঠাকুর্দা। না? না কেন? বেলা বারটা পর্য্যন্ত দিনটা তো বেশ ভালো। পাঁজি আছে?

শ্রীকান্ত। পাঁজির দরকার নেই। বিয়ে আমি কোরতে পারব না।

ঠাকুর্দা। সে কি কথা! উদ্যোগ আয়োজন একরকম সারা বোললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বোলে কথা, ঠাট্টা তামাসার কথা তো নয়। কথা দিয়ে এসে এখন না বোললে চলবে কেন?

শ্রীকান্ত। কথা যে দিয়ে আসিনি, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। বোলেছিলাম, একজনের অনুমতি পেলে রাজী হোতে পারি।

ঠাকুর্দা। অনুমতি পাওনি?

শ্রীকান্ত। না।

ঠাকুর্দা। (মুহূর্ত্তকাল থামিয়া বার কয়েক আড়চোখে শ্রীকান্তের দিকে তাকাইয়া) পুঁটীর বাপ বলে, সর্বরকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরাধরি কোরলে, আরো দু-একশও উঠতে পারে। তা তুমি কি বল হে!

[ইতিমধ্যে রতন ঘরে আসিয়া বলিল]

রতন। আজ্ঞে, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি?

ঠাকুর্দা। না থাক্। তা তোমার নামটী কি বাপু?

রতন। রতন।

ঠাকুর্দা। রতন। বেশ নামটী, থাক কোথায়?

রতন। যেখানেই থাকিনা।

ঠাকুর্দা। কাশীতে? ঠাকুরণটী বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন?

রতন। সে খবরে আপনার দরকার কি?

ঠাকুর্দা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আহা রাগ কর কেন বাপু? রাগের তো কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কি-না, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে।

রতন। (বিরক্ত ভাবে) ও! বড় দরদ!

(প্রস্থানোদ্যত)

ঠাকুর্দা। ওহে বাপু! রাগ কর কেন? দাঁড়াও না, কলঘরটা একটু দেখিয়ে দেবে। সেই রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েচি, চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসি।

[ব্যাগ হইতে গামছা লইয়া রতনের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। শ্রীকান্ত অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল—ইতিমধ্যে পুঁটু আসিয়া জানাইল]

পুঁটু। দেখুন, আপনি দাদামশায়ের কথা বিশ্বাস কোরবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন। অমনি কোরে পরের গয়না চেয়ে দিদির বিয়ে দিয়ে, এখন আর তারা দিদিকে নেয় না। তারা বলে ছেলের আবার বিয়ে দেব।

শ্রীকান্ত। তোমার বাবা কি সত্যিই হাজার টাকা দিতে পারবেন না?

পুঁটু। কক্ষনো নয়। বাবা রেলে মোটে চল্লিশ টাকা মাহিনে পান। আমার ছোট ভায়ের স্কুলের মাইনের জন্যে তার আর পড়াই হোলো না। সে এখন কত কাঁদে।

শ্রীকান্ত। তোমার কি শুধু টাকার জন্যে বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁটু। হ্যাঁ, তাইতো। আমাদের গাঁয়ের অমূল্য বাবুর সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ কোরেছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বোলেই তো সে বিয়ে বন্ধ

হোলো। এবারে বোধ হয় বাবা আর কারো কথা শুনবেন না। সেখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

শ্রীকান্ত। পুঁটু! আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

[পুঁটু সলজ্জে মাথা নীচু করিল]

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমি তো তোমার চেয়ে অনেক বড়।

পুঁটু। জানি।

শ্রীকান্ত। তোমার কি আর কোথাও কখন সম্বন্ধ হয়নি?

পুঁটু। হোয়েছিল তো। আপনাদের গ্রামের কালীদাস বাবুকে জানেন? তার ছোট ছেলে বি. এ. পাশ করেছে। বয়সে আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড। তার নাম শশধর।

শ্রীকান্ত। তোমার তাকে পছন্দ হয়? (পুঁটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া মাথা নীচু করিল) কিন্তু শশধর যদি তোমায় পছন্দ না করে?

পুঁটু। তাই বৈকি! সে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনা-গোনা কোরত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা কোরে বোলতেন, সে শুধু আমার জন্যে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু এ বিয়ে হোলো না কেন?

পুঁটু। তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। এর ওপর আর কোন্না পাঁচশো টাকা খরচ হবে। আমরা গরীব, এত টাকা কোথায় পাব বলুন! তাই আমার মা, ওদের বাড়ি গিয়ে কত হাতে-পায়ে ধরলেন। ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের। কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না।

শ্রীকান্ত। শশধর কিছু বোললে না?

পুঁটু। না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশি বড় নয়। তার বাপ-মা বেঁচে আছে কি-না!

শ্রীকান্ত। তা বটে! আচ্ছা, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটু। না হয়নি, তবে শুনেছি নাকি শিগ্‌গীরই হবে।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হোলে তারা যদি তোমায় ভালো না বাসে?

পুঁটু। আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে বাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেব।

শ্রীকান্ত। তাদের সব কাজ নিশ্চয় কোরবে তো?

পুঁটু। হ্যাঁ, নিশ্চই কোরব।

শ্রীকান্ত। তা হোলে তোমার মাকে গিয়ে বোলো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

পুঁটু। আপনি দেবেন! তা হোলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

শ্রীকান্ত। হ্যা, তাও যাব।

[ইতিমধ্যে ঠাকুদা গামছায় হাত মুখ মুছিতে মুছিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন]

ঠাকুদা। আঃ—চোখে মুখে জল দিয়ে বাঁচলাম ভাই। চোখ-মুখ জ্বালা করছিল। এখন তুমি দুশ্চিন্তার দায় থেকে আমাকে বাঁচাও দাদা। রতন গেল কোথায়? আর এক কল্‌কে তামাক দিক না।

শ্রীকান্ত। রতন!

[ব্যস্ত ভাবে রতনের প্রবেশ]

রতন। বাবু।

শ্রীকান্ত। ঠাকুর্দাকে আর এক কল্‌কে তামাক দাও।

[রতন তামাক সাজিতে বসিল]

শ্রীকান্ত। শুনুন, পুঁটুর বিয়ে আপনি কালীদাসবাবুর ছেলে শশধরের সঙ্গে ঠিক করুন।

ঠাকুর্দা। কিন্তু তারা যে অনেক টাকা চায়।

শ্রীকান্ত। পুঁটুর মুখে আমি শুনেছি। সবসমেত আড়াই হাজার টাকার দরকার তো?

ঠাকুর্দা। হ্যাঁ, তা তো বটেই।

শ্রীকান্ত। ও টাকা আমিই দেব।

ঠাকুর্দা। তুমি দেবে, বল কি ভায়া?

শ্রীকান্ত। আমার কথায় বিশ্বাস কোরে আপনি নিশ্চিন্ত মনে কালীদাস বাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে পারেন।

ঠাকুর্দা। পাকাপাকির আর কি আছে ভায়া? হাজার টাকা নগদ, আর হাজার টাকার গহনা পেলে—এমাসের পঁচিশ তারিখে তো সে বিয়ে দিতে রাজী।

শ্রীকান্ত। তাহলে এ মাসে পঁচিশ তারিখে যাতে বিয়েটা হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

ঠাকুর্দা। বেশ। তবে ব্যাপার কি জানো ভায়া, কালীদাসের পয়সা থাকলে কি হবে, একেবারে ছোট লোক, চামার। বলে রেখেছে, আশীর্ব্বাদের দিন টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে। গয়না-পত্তর নিজের স্যাকরা দিয়ে গড়িয়ে নেবে। ওর কাউকে বিশ্বাস নেই। এমন কি আমাকে পর্য্যন্তও না।

শ্রীকান্ত। তা'বলে আর কি করা যাবে। বিয়ে যখন ওখানে দিতে হবে, উপায় তো কিছু নেই। আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করে আমায় জানাবেন। আমি নগদ টাকা সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ঠাকুর্দা। বেশ, তা হোলে ঐ কথাই রইল ভাই। অনর্থক আর সময় নষ্ট করব না। হাতে ত আর কটা দিন বাকি—এর মধ্যে সব ব্যবস্থা

করতে হবে। ওরে পুঁটী, আর দাঁড়িয়ে থাকিস নে, তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করে নে। রতন! কল্‌কের আগুনটা তাড়াতাড়ি ঝেড়ে এনে দাও ত বাবা, চট্‌পট্‌ বেরিয়ে পড়ি। এখন বেকলে সাড়ে এগারটার গাড়ীটা বোধ হয় ধরতে পারা যাবে।

(রতন কল্‌কেটা লইয়া বাহির হইয়া গেল ও অনতিকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিল)

আশীর্বাদ করি চিরজীবি হও ভায়া। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে তোমার ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ চোখে দেখেনি। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে, তার জোড়া তুমি কখনো পাবে না। নে পুঁটী, তোর দাদার পায়ের ধূলো নে। (পুঁটী শ্রীকান্তকে প্রণাম করিল। শ্রীকান্ত ঠাকুর্দাকে প্রণাম করিল) বেঁচে থাক। সুখে থাক। তা হলে আসি দাদা?

শ্রীকান্ত। আসুন।

[পুঁটু ও ঠাকুর্দা বাহির হইয়া গেলেন। রতন ঠাকুর্দার গমন-পথের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[কালীদাস মুখুজ্যের বাটীর বৈঠকখানা। ছেলের আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে ঘরটী সজ্জিত করা হইয়াছে। ঘর জুড়িয়া ফরাস পাতা—ফরাসের উপর কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া, একটি বড রূপার রেকাবিতে ধান-দুর্ব্বা, চন্দন, গঙ্গাজলের ঘটি দেখা যাইতেছে। ফরাসের উপর পানদান ও কয়েকটা গড়গড়া শোভা পাইতেছিল। ন্যায়রত্ন ও কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সহিত কালীদাসবাবু কথা কহিতেছিলেন]

ন্যায়রত্ন। সময় তো প্রায় হয়ে এল, কন্যাপক্ষ ত এখনো এসে পৌঁছলেন না।

১ম গ্রামবাসী। ঐ প্রসন্নবুড়ো তীরে এসে না তরী ডোবায়।

কালীদাস। কেন? কেন?

১ম গ্রামবাসী। প্রসন্ন মুখুজ্যে তো সেদিন বড় গলায় বলে গেলো, আশীর্ব্বাদের দিন নগদ দু-হাজার টাকা আপনাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে দেবে তা তো বুঝলাম না। এত আয়োজন করার পর শেষ পর্য্যন্ত যদি না এসে পৌঁছয় বড়ই লজ্জার কথা হবে।

কালীদাস। আমার সঙ্গে প্রসন্ন মুখুজ্যে এতবড় তঞ্চকতা করতে সাহস করবে বলে তো মনে হয় না।

২য় গ্রামবাসী। ও সব পারে মুখুজ্যে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। আমি শুনেছি, এই মেয়েটির বড় বোনের বিয়ের সময় ও ধাপ্পাবাজি করেছিল।

কালীদাস। তাই নাকি! কি রকম?

২য় গ্রামবাসী। আজ্ঞে, শুনেচি পরের গয়না পরিয়ে বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর সব গয়না খুলে নেয়।

কালীদাস। প্রসন্ন মুখুজ্যের ও-চালাকিটা আমার কাছে চলবে না। আশীর্ব্বাদের পর নগদ টাকা না পেলে, ছেলের আমি বিয়েই দেব না।

৩য় গ্রামবাসী। প্রসন্ন মুখুজ্যের তো টাকা পয়সা নেই। মানলাম, না হয় জমিজমা বন্ধক দিয়ে, ধার করে নাতনীর বিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছিনা, তাই বা সে করতে যাবে কেন? বলি নাতনী তো আর নিজের নাতনী নয়।

ন্যায়রত্ন। নিজের নাতনী নয়! তবে যে শুনলাম প্রসন্ন মুখুজ্যের দৌহিত্রী?

৩য় গ্রামবাসী। দৌহিত্রী, কি রকম জানেন পণ্ডিতমশাই, বড় শালির মেয়ের মেয়ে।

ন্যায়রত্ন। তাই নাকি! তোমাদের সব কথা শুনে চিন্তার কারণ হোয়ে উঠল দেখছি।

কালীদাস। চিন্তার কি আছে! টাকা নিয়ে যথাসময়ে আসে বিয়ে হবে। না আসে বিয়ে হবে না।

ন্যায়রত্ন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে কিনা, পাকা দেখার উপলক্ষে আপনি আজ এত উদ্যোগ আয়োজন করেছেন—

কালীদাস। ওর জন্য আমি কিছু মনে করিনে পণ্ডিতমশাই। এখানে না হয়, অন্য এক জায়গায় ছেলের বিয়ে তো একদিন হবেই। সেদিন আজকের এই খরচটা, তাদের ঘাড় ভেঙে আদায় না কোরে নিয়ে ছাড়ব ভেবেছেন?

১ম গ্রামবাসী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই। হাজার হোক আপনি বরের বাপ, শুধু শুধু লোকসান কোরতে যাবেন কেন?

কালীদাস। ঘর থেকে খরচ কোরে ছেলেকে বি. এ. পাশ করিয়েছি, যদি কিছু আদায় কোত্তেই না পারলাম—তা'হলে কিসের জন্যে ছেলেকে পাশ করালাম ?

ন্যায়রত্ন। তা বটেই তো ! গেল বছর সেও ঠিক এই বোশেখ মাসে, ঐ রঘুনাথপুরের রায়েদের বাড়ির মেজকর্তার তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করা সেজ-ছেলে, বারশো-টাকা দরে বিকিয়ে গেল। আর এ তো বি. এ. পাশ করা সোনার চাঁদ।

২য় গ্রামবাসী। আহা—তা আর বোলতে।

[সহসা ঠাকুর্দার সহিত শ্রীকান্ত ও পাত্রীর পিতাকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। কালীদাসবাবু তাদের সাদর-অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন]

কালীদাস। এই যে, আসুন, প্রসন্নবাবু আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়।

ন্যায়রত্ন। আপনার বিলম্ব দেখে আমরা বড়ই চিন্তিত হোয়ে পড়েছিলাম প্রসন্নবাবু।

ঠাকুর্দা। আজ্ঞে হ্যাঁ, চিন্তা তো হতেই পারে। একে শুভ-কাজ, তার ওপর আসতেও একটু বিলম্ব হোয়েছে। (শ্রীকান্তকে দেখাইয়া) আমার এই ভায়া, কোলকাতা থেকে আসচেন কিনা, আমরা সব প্রস্তুত হোয়ে এতক্ষণ ওঁরই জন্য অপেক্ষা কোরছিলাম।

কালীদাস। (তাচ্ছিলের সহিত) ওহো, কোলকাতার বাবু !

ঠাকুর্দা। আজ্ঞে না। ঠিক কোলকাতার বাবু ওঁকে বলা চলে না। উনি চাকরী করেন বর্মায়। উপস্থিত ছুটী নিয়ে কোলকাতায় এসে আছেন কিছুদিন। তা যাক্, পাত্রকে আনার ব্যবস্থা করুন। শুভ-কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক্।

কালীদাস। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই যে। ওবে কে আছিস্? শশধবকে আসতে বল।

[সহসা ভিতব হইতে ঘনঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। শঙ্খ-ধ্বনিব মাঝে শশধব ধীবে ধীবে ঘবে প্রবেশ কবিয়া ফবাসেব মধ্যস্থলে উপবেশন করিল ও কবযোড়ে সকলকে নমস্কাব জানাইল]

লীদাস। বুঝলেন প্রসন্নবাবু, এঁবা অনেকেই আপনাব আসা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কচ্ছিলেন।

কুদা। সন্দেহ কেন?

লাদাস। (হাসিযা) হেঁ-হেঁ-হেঁ বুঝতেই পাচ্ছেন, অর্থকরী ব্যাপাব নিযে আব কি!

কুদা। আজ্ঞে, কথা যখন দিযে গেছি, তখন সে ব্যবস্থা না কোরেই কি আমি—

যবত্ন। হ্যা—তা তো বটেই।

কুদা। নিজের অর্থ না থাকলেও দৈবেব কৃপায অনেক সময় তা যোগাড়ও তো হযে যেতে পারে।

লীদাস। কি জানেন প্রসন্নবাবু, নিজেব ট্যাঁকে জোর থাকা এক, আর পরের প্রত্যাশায় থাকা আর এক। এই আমাকে দিয়ে দেখুন না। আমি কোন ব্যাপারই আজ পর্য্যন্ত পরের ভরসা করি না। এই যে টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, জমিদারী যা কিছু আমি কোবেছি দেখছেন, সব নিজের রোজগারে। লোকে বলে বরাত। বরাত কি মশাই অমনি হয়? নিজের বাহুবলে বরাতকে ফেরাতে হয়। জানেন, দেবতার অনুগ্রহ আমি কখনো ভিক্ষে

করিনি। দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

ন্যায়রত্ন। ঠিক, ঠিক।

শ্রীকান্ত। দেখুন কালীদাসবাবু! বাহুর বল আপনার কি পরিমান আছে জানি না। কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে, দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

কালীদাস। তার মানে?

শ্রীকান্ত। মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনি না, কনেকেও না। অথচ টাকা যাচ্ছে আমার এবং সে ঢুকছে গিয়ে আপনার সিন্ধুকে। একে বরাত বলে না তো, বলে কাকে?

[শ্রীকান্তের কথায় সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। ঠাকুর্দা ব্যাপার বুঝিয়া প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন]

ঠাকুর্দা। তা বরাত আর বাহুবল ও দুটোর কোনটাকেই অস্বীকার করার যো নেই। যাকগে যাক্, এখন শুভ-কাজটা শেষ কোরে ফেলা যাক্ ভায়া।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, শুভকাজ শেষ কোরে ফেলতে হবে বৈকি ঠাকুর্দা। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটা কালীদাস বাবুকে পরিষ্কার করে জানানোর দরকার যে, দেবতার অনুগ্রহ তিনি না নিলেও, মানুষের অনুগ্রহ তিনি নেন্।

কালীদাস। অনুগ্রহ তো দূরের কথা, কোন মানুষের আমি পরোয়া করিনে।

শ্রীকান্ত। পরোয়া হয় ত করেন না। কিন্তু অনুগ্রহের পরোয়ানাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেন না। কেন না, আপনার ছেলের হাতের আংটী থেকে বৌয়ের গলার হার পর্য্যন্ত তৈরী হবে

আমারই অনুগ্রহের দানে। হয় ত বা বৌ-ভাতের খাওয়ানটা পর্য্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

[ঠাকুর্দা শ্রীকান্তকে বাধা দেবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—ইতিমধ্যে কালীদাসবাবু ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন]

কালীদাস। আপনি টাকা দিচ্ছেন, তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্ছেনই বা কেন?

শ্রীকান্ত। কেন দিচ্ছি? সে আপনি বুঝবেন না। আপনাকে বোঝাতেও চাই না। কিন্তু দেশশুদ্ধ সকলেই শুনেছে, আমি টাকা দিচ্ছি—কেবল আপনিই শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়ির সকলের হাতে পায়ে ধরেচে। কিন্তু আপনি বি. এ. পাশ করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম কোরতে রাজী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করে। তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই। এটা ভেবে দেখেননি, আপনার ছেলে কেনবার এতটাকা হঠাৎ তারা পায় কোথা? যাই হোক্, ছেলেবেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই। কিন্তু এরপরে গাঁয়ের লোককে বাড়িতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না। এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে বিয়ে দিয়েছেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

[সকলে ভয়ে মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল, ঠাকুর্দা ভয়ে জড়-সড় হইয়া গেলেন। কালীদাস বাবু বলিলেন]

কালীদাস। টাকা আমি নেব না।

শ্রীকান্ত। তার মানে? ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালীদাস। না, তা নয়। আমি কথা দিয়েছি বিয়ে দোব, তার নড়-চড় হবে না। কালীদাস মুখুজ্যে কথার খেলাপ করে না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, আপনার নামটী জানতে পারি কি ?

ঠাকুর্দা। বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! ওর নাম শ্রীকান্ত।

কালীদাস। শ্রীকান্ত ?

ঠাকুর্দা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীদাস। ও, এর বাপের সঙ্গে না আমার একবার ভয়ঙ্কর ফৌজদারী মামলা বাধে ?

ঠাকুর্দা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। এ তারই ছেলে—সম্পর্কে আমার নাতি হয়।

কালীদাস। তা হোক্। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে এমনি বয়স হোত। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নেমন্তন্ন রইল।

[শশধর শ্রীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ নীচু করিল। শ্রীকান্ত উঠিয়া গিয়া কালীদাসবাবকে প্রণাম করিয় বলিল]

শ্রীকান্ত। যেখানেই থাকি অন্ততঃ বৌভাতের দিনে এসে নব-বধূর হাতে অন্ন খেযে যাব। কিন্তু আপনাকে আমি অনেক রূঢ় কথা বলেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা কোরবেন।

কালীদাস। রূঢ় কথা বলেছ সত্যি। কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমাও কোরেচি। শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন কোরে রেখেছি। উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীকান্ত। যে আজ্ঞে। তাই হবে। কিন্তু শুভকর্ম্মটাই যে এখন পড়ে রইল। আসুন সকলে মিলে সেটা শেষ করা যাক্।

কালীদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই। আসুন পণ্ডিত মশাই।

[ন্যায়রত্ন শশধরের সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া গঙ্গাজল লইয়া আচমন সুরু করিলেন। নেপথ্যে মেয়েরা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে লাগিল]

সপ্তম দৃশ্য

[গহরের বাড়ির সদর দরজার সম্মুখ ভাগ। অপরাহ্ণকাল—কেহ কোথাও নাই। কেবল দূর হইতে ঘুঘুর ডাক ভাসিয়া আসিতেছে। নয়ন চক্রবর্ত্তী আহারাদির পর কলিকা বিহীন খেলো হুঁকোটী হাতে লইয়া গহরের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ও জোরে জোরে বার-দুই কড়া নাড়িল। তাহার কড়া নাড়ার আওয়াজে ভিতর হইতে নবীন সাড়া দিয়া কহিল "কেডা গো?" বাহির হইতে নয়ন চক্রবর্ত্তী বলিল, "এই যে আমি"]

(নবীন দরজা খুলিল—তাহার হাতে একটি জ্বলন্ত বিচালীর নুড়ো)

নবীন। এই যে, চক্কোবত্তি মশায়!

নয়ন। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়ার পর এলাম একটু তোর কাছে।

নবীন। তা বুঝছি, তামাক খেতে হবে।

নয়ন। (একগাল হেসে) হ্যাঁ, তুই ঠিক ধরেছিস।

নবীন। ধরব বৈকি, হুঁকোয় কলকে না দিয়েই যখন এসেছ, তখন কি আর বুঝতে বাকি থাকে! তা দাঁড়াও, কলকে ধরাব বলে এই নুড়োটা জ্বেলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কলকেটা ধরিয়ে নিয়ে আসছি।

[ভিতরে প্রস্থান—নয়ণ দরজার সমুখে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে নবীন এক হাতে একটী থেলো হুঁকো অপর হাতে কলকে ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল]

নয়ন। নে, তোকে আর কষ্ট করতে হবে না নবীন, দে কলকেটা ধরিয়ে দিই।

নবীন। তুমি ধরালে কি তার কিছু থাকবে ঠাকুর মশায়! লোকে কথায় বলে বামুনে টান্। তা নাও, পেসাদ একটু রেখো।

[কলকেটী নয়কে দিল। নয় হুঁকায় কলকেটী লাগাইয়া জোরে জোরে বার কয়েক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল]

নয়ন। তোর হাতে সাজা তামাক সত্যি বলছি বড্ড ভাল। তামাক তো খায় অনেকে, সাজতে পারে ক'জন ?

নবীন। হুঁ। তা নাও তাড়াতাড়ি দুটান টেনে। এই খেয়ে-দেয়ে উঠলাম। খাওয়ার পরে তামাকটা না খেলে শরীরের যেন ঠিক তোয়াজ হয় না।

নয়ন। তা যা বলেছিস নবীন।

নবীন। দাও, কলকেটা দাও।

নয়ন। দাঁড়া না, নবীন! এই তো সবে দুটান্ দিয়েছি। বামুনের পেসাদ পাবার জন্যে লোক হাপিত্যেস করে তা জানিস্?

নবীন। জানি। সে বামুন আলাদা বামুন।

নয়ন। তার মানে?

নবীন। মানে বুঝে নাও।

নয়ন। (হাঁসিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ। তা তুই তোর দাদাবাবুর জন্যে এত

করছিস নবীন, কিন্তু তুই তার আর একবার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারছিস নে ?

নবীন। কি করব বলো চক্কোবত্তি মশায়, দাদাবাবু যে আর বিয়ে করতে চায় না। বলে, ঘর সংসার করা আমার অদেষ্টে নেই। নইলে অমন বৌ হঠাৎ মাটি নেবে কেন ? মাঝে মাঝে দেখি তার বিবির কবরের কাছে গিয়ে নমাজ করে। কি বলব চক্কোবত্তি মশায়, দেখে আমার বুকটা ফেটে যায়।

নয়ন। আহা ! তা আর নয়। তা হাঁ নবীন, লোকে যা বলে তা কি সত্যি ?

নবীন। লোকে কি বলে ?

নয়ন। লোকে বলে গহর নাকি মুরারীপুরের আখড়ায পড়ে থাকে।

নবীন। লোকে বলে না ঠাকুর মশায়, ওটা তুমি বল।

নয়ন। আমি বলি ?

নবীন। হ্যাঁ। আমি শুনেছি তুমি আখড়ার কথা নিয়ে দাদাবাবুর নামে ঘোট পাকিয়ে বেড়াচ্ছ।

নয়ন। ঘোঁট পাকিয়ে বেড়াচ্ছি ! মিথ্যে বদনাম অমনি দিলেই হোল ?

নবীন। মিথ্যে বদনাম ? চল দেখি, সামন্তদের পাড়ায় ভজিয়ে দিতে পারি কি-না ? কত্তাবাবু তোমার জমি-জমা, বাগান, পুকুর, মায় বাস্তু তোমার যা কিছু সম্পত্তি নিলেম করে নিয়েছিল, দাদাবাবু তা ফিরিয়ে দিলে, আর তুমি কিনা, এখন ছুতয়-নাতায় আমার কাছে জানতে আসো দাদাবাবু আখড়ায় গেছে কিনা ? স্তাখ চক্কোবত্তি, তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না।

নয়ন। কেন ? তুই কি বাড়ির মালিক না কি ?

নবীন। এ বাড়ির আমি কি তুমি, সেদিন জানতে পারবে ঠাকুরমশাই, যেদিন আমি ব্রহ্ম-রক্ত দর্শন করব।

নয়ন। কি! তুই আমার রক্ত-দর্শন কোরবি? তোকে আমি ফাটকে দোব।

নবীন। যাও যাও, সবাই ফাটকে দেয়। কলেকটি আগে ফেরৎ দিয়ে তারপর ফাটকে দিও।

নয়ন। এই নে তোর কলকে। তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে তোর কলকেয় আমি তামাক খেয়েছি।

নবীন। আমার চোদ্দপুরুষের পোড়াকপাল যে, তোমার মত বামুনকে আমি কলকে দিয়েছি।

নয়ন। কী? এত বড় কথা! আচ্ছা, আমি তোকে দেখে নেব।

[গজ-গজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল—নবীন দরজায় খিল্ আঁটিয়া দিল। সহসা অপরদিক হইতে শ্রীকান্ত আসিয়া কড়া নাড়িল]

নবীন। (ভিতর হইতে) আবার কে গো?

শ্রীকান্ত। এই যে, আমি।

[নবীন খিল্ খুলিয়া শ্রীকান্তকে দেখিয়া বলিল]

নবীন। শ্রীকান্তবাবু যে!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, গহর কোথায়?

নবীন। কি আর বোলব বাবু, দেখুনগে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরেই আসা হয়নি।

শ্রীকান্ত। সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী আবার এল কোথা থেকে?

নবীন। একটা নাকি? একপাল এসে জুটেছে।

শ্রীকান্ত। কোথায় থাকে তারা ?

নবীন। ঐতো ঐ মুরারীপুরের আখড়ায়। কি আর বোলব বাবু! সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরাদাস-বাবাজী মোলো, তার জায়গায় এসে জুটলো এক ছোকরা বৈরাগী। তার আবার গণ্ডাকয়েক সেবাদাসী। ঐ দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব। প্রায়ই তো আজকাল থাকেন সেখানে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু তোমার বাবু তো মুসলমান। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন ?

নবীন। ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধম্ম-ধম্ম জ্ঞান আছে নাকি ? এই দেখুন না, একটু আগে নয়ন চক্কোবত্তর সঙ্গে বেশ আমার খানিকটা ঝগড়া হোয়ে গেল।

শ্রীকান্ত। তাই নাকি! কেন, কি বোলেছিল সে ?

নবীন। বোলবে আবার কি ? শুধু ছুতোয়-নাতায় জানতে চায়, বাবু আখড়ায় গিয়েছে কিনা। বুঝলেন না ? কথাটা জানতে পারলে ঘোট পাকাবার বেশ সুবিধে হয়। তা দিইছি আজ বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে। জানি, বাবু আখড়াতে আছেন। কিন্তু ওর কাছে সে কথা কবুল কোরলে কি আর রক্ষে আছে ? আমার হয়েছে এক জ্বালা! বাবু ওখানে যায় তাও আমি সহ্য কোরতে পারি নে, আবার ওখানে যাওয়া নিয়ে বাবুকে পাঁচকথা বলে তাও সহ্য কোরতে পারি নে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ-সাতদিন ছিলাম, তখন তো গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি!

নবীন। বোললে যে কমলিলতার গুণাগুণ বেরিয়ে পড়তো। আপনি যে ক'দিন ছিলেন, সে কদিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি।

আর যাই আপনি চলে গেলেন, বাবু অমনি খাতা, কাগজ, কলম নিয়ে আখড়ায় ঢুকলেন।

শ্রীকান্ত। খাতা, কাগজ, কলম নিয়ে?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, ঐ দ্বারিক বৈরিগী যে ছড়াগান বাঁধতে পারে। আমার বাবুরও যে ঐ বাই, বেশ মিলেছে ভাল। আর বলেন কেন, টাকাকড়ি পর্য্যন্ত বাবু নয়-ছয় করে ফেললেন। ঐ সেদিন আখড়ার পাঁচীল পড়ে গেল, নিজের টাকায় সে পাঁচীল তুলে দিলেন।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা নবীন, আখড়াটী আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পার?

নবীন। আজ্ঞে মাপ কোরবেন, আপনিও তো এদেশেরই মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ ক্রোশের বেশী নয়। ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিদে উত্তর মুখে চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞেস কোরতে হবে না। সামনে দীঘির পাড়ে, বকুল-তলায় বৃন্দাবনলীলা চলছে, দূর থেকে আওয়াজ কানে যাবে, ভাবতে হবে না।

শ্রীকান্ত। কি হয় সেখানে? কীর্ত্তন?

নবীন। হ্যাঁ, দিন-রাত। খঞ্জনী, খরতালের কামাই নেই।

শ্রীকান্ত। ও, আচ্ছা যাই গহরকে ধরে আনিগে।

নবীন। হ্যাঁ যান, কিন্তু দেখবেন, কমলিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না?

শ্রীকান্ত। (হাসিয়া) দেখি কি হয়। (চলিয়া গেল)

[নবীন সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

অষ্টম দৃশ্য

[মুরারীপুরের আখড়া—তখন সন্ধ্যারতি হইয়া গিয়াছে। দাওয়ার উপর দ্বারিকদাস বাবাজী, ও নীচে গহর। উভয়ে আলোচনা করিতেছিল]

দ্বারিকদাস। আমার মনে হয় গহর গোসাই, তোমার বন্ধু বোধ হয় আর এলো না। কোলকাতা থেকে সোজা বমায় পাড়ি দিল।

গহর। না-না—দেখা কোবে যাবো বলে যখন কথা দিয়েচে, দেখা না কোবে সে কিছুতেই যাবে না।

দ্বারিক। এত বিশ্বাস তোমার বন্ধুর ওপর হোল কি করে?

গহর। হবে না! সংসারে সেও যে একা; তাই পথ চলতে বন্ধুর প্রয়োজন যে তার সব চেয়ে বেশী। তাই ত সে আসবে বলে পথের পানে চেয়ে আছি।

দ্বারিক। তুমি প্রেমিক, তোমার প্রেমে যে মজবে তাকে তোমার কাছে না এসে উপায় নেই। কি গানটা যেন সেদিন গাইছিলে?

গহর। শুনবে? (গহর গাহিল)

আমি তোমার বাঁশী শুনেছিলাম
প্রেম-যমুনার পারে—
তাই সুরের রসে রসিয়ে নিলাম
এক-তারারে—

[উপরোক্ত গানের মাঝে শ্রীকান্ত কখন যে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় গহর টের পায় না, গান থামিলে শ্রীকান্ত ডাকে]

শ্রীকান্ত। গহর!

[গহর চমকাইল]

গহর। কে? দেখ গোঁসাই, দেখ, বলেছিলাম কিনা সে আসবে—

[গহর শ্রীকান্তকে জড়াইল]

দ্বারিক। গহর গোঁসাই, এই তোমার শ্রীকান্ত না?

গহর। হ্যাঁ। যে বলেছিল মনের মধ্যে আছে মকরন্দ।

শ্রীকান্ত। কিন্তু গহর, বাবাজী হঠাৎ আমাকে চিনলেন কি কোরে?

দ্বারিক। (হাত নাড়িয়া) উঁহুঁ, ও চলবে না গোঁসাই। ক্রিয়াপদের শেষে, ঐ সম্ভ্রমের ন-টী বাদ দিতে হবে, তবে ত রস জমবে।

শ্রীকান্ত। তা যেন দিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি কোরে?

দ্বারিক। হঠাৎ চিনব কেন? তুমি যে অমোদের বৃন্দাবনের চেনা-মানুষ গোঁসাই। তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্দুর। ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যে দিন কমললতা এলো, তারও এমনি দুটি চোখ। তাকে দেখেই চিনলাম, কমললতা। কমল এসে সেই যে আপনার হোল তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ কিছুই রইল না। এই তো সাধনা গোঁসাই, একেই তো বলি রসের দীক্ষা।

শ্রীকান্ত। কমললতাকে দেখব বলেই তা এসেচি গোঁসাই; কোথায় সে?

দ্বারিক। ভাবচ কেন? তুলসী-তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেবার সময় হোল, সে এলো বলে। কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই। বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচ। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে সেই কমললতা। তা তুমি বর্মায় যাচ্ছ কবে?

শ্রীকান্ত। এখনও কিছু ঠিক করিনি। কিন্তু আমার বর্মা যাওয়ার খবর তুমি পেলে কি কোরে?

দ্বারিক। দীর্ঘকাল পরে তোমার মিলনে যে মুগ্ধ হোয়ে আছে, সেই অকপটে বোলেচে সব কথা।

শ্রীকান্ত। যাক্ তবু ভাল। স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, বৈরাগী বাবাজী বুঝি কোন অলৌকিক শক্তিবলে আমাকে দেখা মাত্র সব মনের কথা বোলতে আরম্ভ করেছেন।

(গহর ও দ্বারিকদাস হাসিয়া উঠিল)

দ্বারিক। আমরা রসের কারবারি, কিছুই আমাদের কাছে অলৌকিক নেই।

[ইতিমধ্যে কমললতা একটি জ্বলন্ত প্রদীপ লইয়া উঠানে প্রবেশ করিল এবং তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ দেখাই প্রণাম করিল—কমললতা উঠিয়া দাঁড়াইতেই গহর বলিল]

গহর। ত্থাখ কমল, কে এসেছে।

[কমললতা শ্রীকান্তর দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল]

কমললতা। ওমা! তাইতো! কি গোঁসাই চিনতে পার?

শ্রীকান্ত। না—কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি দেখেচি মনে হচ্ছে।

কমল। দেখেচ, বৃন্দাবনে। বড় গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো?

শ্রীকান্ত। শুনেছি, কিন্তু বৃন্দাবনে আমি তো কখন জন্মেও যাইনি।

কমল। গেছ বৈকি! অনেক কালের কথা, মনে করতে পারছ না। তা এখানে সন্ধান দিলে কে? নবীন?

শ্রীকান্ত। হাঁ—সেই।

কমল। কমললতার খবর বলেনি ?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ তাও বলেছিল।

কমল। বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না—তোমাকে সাবধান করে দেয়নি ?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তাও দিয়েচে।

কমল। নবীন হুঁসিয়ার মাঝি, তার কথা না শুনে ভাল করনি। যাক্ ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই, এখানে কমলের বোন আছে। এসো—

[কমললতার আহবানে শ্রীকান্ত গহরের দিকে চাহিল ও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—গহর বলিল]

গহর। যাও না। এদের সংসারটাকে দেখে এসো না।

(শ্রীকান্ত কমললতার সহিত চলিয়া গেল)

দ্বারিক। বা-বা-বা, বেশ বোলেচ গহর গোঁসাই, বেশ বোলেচ। গোবিন্দজীউর সংসারের মাঝে তোমার বন্ধুকে প্রবেশ করতে বলেচ।

গহর। আমার ছন্নছাড়া বন্ধু, যার সংসারে আর কেউ নেই তাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝে এনে ফেলব বলেই ত আমি এমন করে ওর আসা-পথ চেয়ে বসেছিলাম। সে আসা আমার পূর্ণ হয়েচে। গোঁসাই আমি যাই, আমি যাই।

[গহর গোঁসাই যাইতে যাইতে পুনরায় গান ধরিল।]

আমি তোমার নামে ভাসিয়া তরী
গুণে দিলাম প্রেমের কড়ি॥
তোমায় নিয়ে ডুববো আমি জানি,
তোমায় নিয়ে ডুববো আমি
দেখি তুমি ডুবাও কারে॥

[বড় গোসাই ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। গহর মঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত ঘর হইতে দাওয়ায় আসিয়া ডাকিল]

শ্রীকান্ত। গহর!

[ইতিমধ্যে কমললতা তাহার পিছনে আসিয়া বলিল]

কমল। গহর গোসাই চলে গেছে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে যাব।

কমল। কেন? এখানে থাকতে কি ভয় হচ্ছে!

শ্রীকান্ত। না-না, গহর রাগ করবে যে।

কমল। সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না। এসো।

[কমললতার আহ্বানে শ্রীকান্ত মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিল; ভাবে বিভোর দ্বারিকদাস একভাবে বসিয়া রহিলেন। দূর হইতে গহরের কণ্ঠ ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মুরারীপুরের আখড়ার অপরাংশ। তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছে। অন্ধকার তখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বিভিন্ন জাতির পাখীর কলরব শোনা যাইতেছে। ধীরে ধীরে আশ্রম-সংলগ্ন ফুলবাগানে কমললতাকে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। কমললতা ফুল তুলিতেছিল ও একাকী গান গাহিতেছিল গুণ গুণ করিযা। শ্রীকান্ত ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিযা দাঁড়াইয়া কহিল]

শ্রীকান্ত। তোমাদের সংসারের কাজ বুঝি ফুল তোলা দিয়েই সুরু হোল ?

কমললতা। হ্যাঁ।

শ্রীকান্ত। রোজই কি এমনি সময উঠতে হয নাকি ?

কমল। তা হয় বৈকি ! এখন না উঠলে চলবে কেন ? একটু পরেই যে ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি সুরু হবে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু এখনও যে রাতের অন্ধকার কাটেনি।

কমল। অন্ধকার থেকে আলোর ছোঁয়া পাব বলেই তো আমরা নিত্যি এই সময় উঠি।

শ্রীকান্ত। কমল ! তোমাদের সংসারের কাজ দেখলুম, বাট্না-বাটা, কুটনো-কোটা, ঠাকুরের কাপড়ে রঙ করা, এমনি আরো কত কি। কিন্তু তোমরা সাধন ভজন করো কখন ?

কমল। এই তো আমাদের সাধন ভজন।

শ্রীকান্ত। এই তোমাদের সাধন ভজন ! এ তো সাংসারিক কাজ।

কমল। হ্যাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা। আমাদের আর কোন সাধন ভজন নেই।

(শ্রীকান্ত সবিস্ময়ে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

কি গোঁসাই, অমন করে চেয়ে আছ যে! আমাদের সাধন ভজনের ব্যাপারটা ভালো লাগল না বুঝি?

শ্রীকান্ত। না, তা নয়। ভাবচি—

কমল। কাকে ভাবচ?

শ্রীকান্ত। ভাবছি তোমাকে।

কমল। ইস্! আমার বড় সৌভাগ্য। তবুও থাকতে চাওনা। কোথায় কোন্ বার্মীদের দেশে চাকরী কোরতে যেতে চাও।

শ্রীকান্ত। চাকরী না কোরে উপায় কি? আমার তো মঠের জমি-জমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাব কি?

কমল। ঠাকুর দেবেন।

শ্রীকান্ত। ঠাকুরই যদি দেবেন, তো তোমরা ভিক্ষে কোরতে যাও কেন?

কমল। যাই, তিনি দেবেন বোলে। হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বোলে, নইলে নিজেদের গরজ নেই—থাকলেও যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

শ্রীকান্ত। আচ্ছা কমললতা, সবই তো শুনলাম, তোমার দেশ-ঘর কোথায় ছিল তা তো বোললে না।

কমল। ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

শ্রীকান্ত। তা হলে গাছতলায় আর পথে না থেকে, মঠে থাক কিসের জন্যে?

কমল। অনেকদিন পথে পথে ছিলাম গোঁসাই। সঙ্গী পাই তো আবার একবার পথই সম্বল করি।

শ্রীকান্ত। তোমার সঙ্গীর অভাব, একথা আমার বিশ্বাস হয় না

কমললতা। যাকে ডাকবে, সেই যে রাজী হবে।

কমল। তোমাকে ডাকচি নোতুন গোঁসাই, রাজী হবে?

শ্রীকান্ত। রাজী। কিন্তু আমি বলি কি, এখানে থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেও না।

কমল। গেলে তোমার লোকসান কি? শোন গোঁসাই, মুরারী ঠাকুরের একটা গান আছে।

[কমললতা গাহিল]

"সখি হে, ফিরিয়া আপনার ঘরে যাও,
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥"

কমল। গোঁসাই, বিকালে তুমি কোলকাতায় চলে যাবে। আজ একটা-বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না, না?

শ্রীকান্ত। সে কথা এখন বলি কি করে?

[কমললতা গাহিল]

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি—দুখ যায় তারই ঠাঁই॥"

শ্রীকান্ত। তার পর?

কমল। তারপর আর জানি নে।

শ্রীকান্ত। তবে আর একটা কিছু গাও।

[কমললতা গাহিল]

"চণ্ডীদাস বানী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা॥"

শ্রীকান্ত। তারপর?

কমল। তারপর আর নেই, এখানেই শেষ। আচ্ছা গোঁসাই, এ-বয়সে সত্যই কি কাউকে কখনো ভালবাসনি?

শ্রীকান্ত। তোমার কি মনে হয় কমললতা?

কমল। আমার মনে হয় না, তোমার মনটা হোল আসল বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন, প্রজাপতির মত। বাঁধন তুমি কখন কোন কালেই নেবে না।

শ্রীকান্ত। প্রজাপতির উপমা তো ভাল হোলো না কমললতা। ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালবাসার মানুষ সত্যিই কোথাও যদি থাকে, তার কানে গেলে সে যে অনর্থ বাধাবে।

কমল। ভয় নেই গোসাই, সত্যই যদি কেউ থাকে, আমার কথায় সে বিশ্বাসও কোরবে না, তোমাদের আর আমাদের ভালবাসার প্রকৃতি যে বিভিন্ন।

শ্রীকান্ত। কি রকম?

কমল। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা। তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। নির্ভর হোতে পারার চেযে, ভালবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই। কিন্তু ঐ জিনিসটী যে কেউ কখনো তোমার কাছে পাবে না।

শ্রীকান্ত। পাবে না, তুমি নিশ্চিত জানো?

কমল। নিশ্চয জানি।

শ্রীকান্ত। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এত তুমি জানলে কি করে?

কমল। জানলাম তোমাকে ভালবেসেচি বোলে।

শ্রীকান্ত। ভালবেসেচ! একি সত্যি কমললতা?

কমল। হ্যাঁ সত্যি।

শ্রীকান্ত। কিন্তু তোমার জপ তপ, তোমার কীর্ত্তন, তোমার রাত্রি-দিনের ঠাকুর-সেবা এ-সবের কি হবে বলো ত?

কমল। এরা আমার আরো সত্যি, আর সার্থক হয়ে উঠবে।

[সহসা কমললতা কাহাকে যেন দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অদূরে মন্দিরেব মঙ্গল-আবতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

শ্রীকান্ত। ওকি কমললতা, অমন কোবে চমকে উঠলে যে?

কমল। না, না,—ও কিছু নয়। মঙ্গল-আরতি সুরু হোল, আমি যাই। (প্রস্থান)

[শ্রীকান্ত কিছুক্ষণ কমললতার গমন পথের দিকে চাহিয়া রাহিল, পরে ধীরে ধীরে সে তাহার গমন পথ অনুসরণ করিয়া দু-একপদ অগ্রসব হইতেই গাছের আড়াল হইতে মন্মথ নামে একটি লোক বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল]

মন্মথ। মশাই!

[শ্রীকান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল লোকটির বয়স বছর চল্লিশ, খর্বাকৃতি রোগা গড়ন—গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক ছোট, চোখের ভ্রু-দুটি তেমনি দীর্ঘ প্রস্থে বিস্তীর্ণ। মশাই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত বলিল]

শ্রীকান্ত। আজ্ঞা করুন।

মন্মথ। আপনি এখানে কবে এসেছেন, শুনতে পারি কি?

শ্রীকান্ত। পারেন। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?

মন্মথ। প্রয়োজন আর কি! আখড়াতেই থাকা হয় বুঝি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

মন্মথ। রাত্রিতেও আপনাকে আখড়ায় থাকতে দ্যায়?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, দ্যায়।

মন্মথ। তা আপনি ত বোষ্টম নন, আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে?

শ্রীকান্ত। সে খবর তাঁরাই জানেন, তাঁদের জিগ্যেস কোরবেন।

মন্মথ। ও, কমলিলতা থাকতে বোললে বুঝি?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

মন্মথ। অ! জানেন, ওর আসল নাম কি?

শ্রীকান্ত। না।

মন্মথ। ওর আসল নাম হচ্ছে উষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে। কিন্তু দেখায় যেন ও কোলকাতার মেয়েমানুষ। আমার বাড়িও সিলেটে, গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব চরিত্র?

শ্রীকান্ত। না, প্রযোজন নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?

মন্মথ। সম্বন্ধ! সেই কথাই তো বোলচি মশাই। ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠি বদল করিয়েছিল। তা যাক্, ওকে একবার ডেকে দিতে পারেন?

শ্রীকান্ত। না, আখড়ায় সবাই যেতে পারে। ইচ্ছে কোরলে আপনিও যেতে পারেন।

মন্মথ। যাব মশাই, যাব। পেয়াদা সঙ্গে করে একেবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে নিয়ে আসব। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা Rascale কোথাকার!

(বেগে প্রস্থান)

[লোকটী যেমন ঝড়ের মতন আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মতন প্রস্থান করিল। শ্রীকান্ত চিন্তিত মনে অগ্রসর হইতে যাইবে এমন সময় নবীন তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

শ্রীকান্ত। কি নবীন? এত জোরে তুমি হঠাৎ যে!

নবীন। কি করি বাবু? আজ দুদিন, দুরাত দাদাবাবু যে বাড়ি ফিরল না।

শ্রীকান্ত। সে কি! বাড়ি ফেরেনি? তোমার কথা শুনে বড়ই ভাবনা হচ্ছে নবীন। তার তো খোঁজ করা দরকার।

নবীন। কিন্তু কোথায় খুজব বাবু? বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তো আর নিজের প্রাণটা দিতে পারি না। কিন্তু তাকে পেলে একবার জিজ্ঞাস করে যেতাম।

শ্রীকান্ত। কাকে?

নবীন। ঐ যে কমলিলতা।

শ্রীকান্ত। কিন্তু সে জানবে কেমন করে নবীন?

নবীন। জানে না! ও সব জানে। বোষ্টমী মন্তর জানে, ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নবীনের পাল্লায়, ওর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতাম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেল্কিতে উড়িয়ে দিলে!

শ্রীকান্ত। কিন্তু কমললতা টাকা নিয়ে কি কোরবে নবীন? বোষ্টম-মানুষ, মঠে থাকে। গান গেয়ে দুঃখ ভিক্ষে কোরে ঠাকুর দেবতার সেবা করে। দুবেলা দুমুটো খাওযা বৈ ত নয়। ওকে টাকার কাঙাল বলে তো আমার বোধহয় না নবীন।

নবীন। ওর নিজের জন্যে যে নয় বাবু, তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দর ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা তেমনি

কথা-বার্ত্তা। বড় বাবাজীটাও লোভী নয়। কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েচে যে। ঠাকুর সেবার নাম কোরে তাদের যে লুচিমোণ্ডা, ঘি-দুধ নিত্য চাই। নয়ান চক্কোবত্তির মুখে কানাঘুসো শুনছি, আখড়ার নামে বিশ-বিঘে জমি নাকি খরিদ হোয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু। যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়ে একদিন ঢুকবে।

শ্রীকান্ত। হয়ত গুজব সত্যি নয়। নয়ান চক্কোবত্তি লোকটা তো সুবিধের নয়। মিথ্যে গুজব ও তো রটাতে পারে?

নবীন। তা পারে, বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ, কিন্তু বিশ্বাস না করি কি করে বলুন? সেদিন যামনকা আমার ছেলেপিলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে।

শ্রীকান্ত। তাই নাকি?

নবীন। হ্যাঁ বাবু। অনেক মানা করলুম শুনলে না। বাপ বহুৎ রেখে গেছে মানি। কিন্তু বিলোলে থাকে কদিন বাবু?

শ্রীকান্ত। সে তো ঠিকই।

নবীন। বলে, আমরা ফকীরের বংশ। ফকিরী আমার তো কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না। বলুন বাবু, এমন মানুষ রাত্তিরে বাড়িতে না ফিরলে ভয়-ভাবনা হয় কিনা?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তা তো বটেই, ভয় তো হবারই কথা।

নবীন। যাই, বন-বাদাড় হাটকে দেখিগে, খুঁজে পাই কিনা।

(ব্যস্তভাবে নবীন প্রস্থান করিল। অপর দিকে চিন্তিত-মনে শ্রীকান্ত আখড়ার দিকে অগ্রসর হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আখড়ার একটি ঘর। তখন মঙ্গল-আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে, কমললতা ঠাকুরের কতকগুলি কাপড় পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। সহসা শ্রীকান্ত ঘরে প্রবেশ করিলে, কমললতা জিজ্ঞেস করিল]

কমললতা। এই যে, এসো গোঁসাই, বস। বাগানে ও লোকটা তোমাকে কি বোলছিল ?

শ্রীকান্ত। লোকটাকে তুমি দেখেছিলে নাকি ?

কমল। হ্যাঁ।

শ্রীকান্ত। লোকটা বোলছিল, সে তোমার স্বামী। অর্থাৎ তোমাদের সামাজিক আচার মতে তুমি তার কণ্ঠিবদল করা পরিবার।

কমল। তুমি বিশ্বাস করেছ ?

শ্রীকান্ত। না।

কমল। সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি ?

শ্রীকান্ত। করেচে।

কমল। শুনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস ? কিন্তু হয়তো তোমার ঘৃণা হবে।

শ্রীকান্ত। তবে থাক্, ও আমি শুনতে চাই না।

কমল। কেন ?

শ্রীকান্ত। তাতে লাভ কি কমললতা ? তোমাকে আমার ভারি ভালো লেগেছে, হয়তো আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। যাবার সময় আমার সেই নিরর্থক ভালোলাগাটুকু নষ্ট করে লাভ কি ?

কমল। কিন্তু এই ভালোলাগার জন্যে আমার সেই মন্দটুকু যে তোমাকে শুনতে হবে গোসাই। ঠাকুরকে স্মরণ করে বোলছি, তোমাকে মিথ্যে বলব না।

শ্রীকান্ত। ঠাকুরের দোহাই না দিয়ে বোললেও তোমাকে বিশ্বাস কোরবো কমল।

কমল। তবে বলি শোন। একদিন গহর গোসাইয়ের মুখে শুনলাম, হঠাৎ তার পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন তার বাড়িতে। ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না, সে রহলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে। আবার ভাবলাম, এ কেমনধারা বামুন-বন্ধু, যে অনায়াসে পড়ে রইল মুসলমানের ঘরে! তার কি কেউ কোথাও নেই নাকি!

শ্রীকান্ত। গহর কি বললে?

কমল। গহর গোসাই ঠিক এই কথাই বোললো। বোললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বোলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই। মনে মনে বোললুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা কোরলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোসাই? নাম শুনে চমকে গেলুম, বুকের ভেতরটা ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল।

শ্রীকান্ত। কেন?

কমল। আমার স্বামীর নাম। তাই গহর গোসাইয়ের মুখে ও-নামটা শুনে আমি চমকে উঠি। আর এর জন্যেই তোমাকে নোতুন গোসাই বলে ডাকি। ও নামটা মুখে আনতে পারি নে।

শ্রীকান্ত। বুঝেছি, তারপর?

কমল। শ্রীহট্টে আমাদের বাড়ি, বাবা কোলকাতায় ব্যবসা কোরতেন। মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকতেন। ছেলেবেলা থেকেই আমি বাবার কাছে থাকতাম। কোলকাতাতেই আমি মানুষ,

কোলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়। আবার সতেরো বছর বয়সে কোলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই। এর কিছুদিন পরে কালো মেঘের মত ঐ মন্মথ এসে আমার জীবনটাকে ঘিরে ফেললে।

শ্রীকান্ত। তার মানে?

কমল। ওর সংস্পর্শে এসে বৈধব্য জীবনের ধ্রুবতারাকে আমি হারিয়ে ফেলি। আমি পথভ্রষ্ট হই। কথাটা বাবার কানে যায়। বাবা যেমন নিষ্ঠাবান, তেমনি শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমাকে কিছুই বোললেন না। কিন্তু দু-তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তারপর গুরুদেবের পরামর্শে বাবা আমাকে নবদ্বীপে নিয়ে গেলেন। কথা হ'ল ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল করে নোতুন আচারে মন্মথর সঙ্গে হবে আমার বিয়ে। উদ্যোগ আয়োজন চলল। এরই মাঝে মন্মথ হঠাৎ বোললে, আমার অবস্থার জন্য সে মোটেই দোষী নয়—বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় তো বিশ হাজারের কমে পারবে না। মন্মথর ব্যবহারে ঘৃণায় আমার মন বিষিয়ে উঠল—

শ্রীকান্ত। তারপর?

কমল। তারপর গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ-শুচি হয়ে, মাথায় তিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে হঠাৎ একদিন নবদ্বীপ এসে অবতীর্ণ হলেন। বুঝলাম বাবার কাছে টাকা আদায় সে করেছে। মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চকের গলায় মালা পরাতে প্রবৃত্তি হোল না—শুধু ঊষাঙ্গিনীর নোতুন নামকরণ হ'ল কমললতা।

শ্রীকান্ত। এর পরে কি হ'ল কমললতা?

কমল। সত্যি বল গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

শ্রীকান্ত। সত্যি বলছি করে।

কমল। এর পরে আত্মীয়-স্বজনের সামনে ে. ক'লোমুখ দেখাতে আর প্রবৃত্তি হোল না। তাই বাড়ি ফিরে যাওয়ার সংকল্প আমি চির-দিনের মত ত্যাগ করলুম। স্নেহান্ধ পিতা অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না—শেষে বাবা কেঁদে বোললেন, আমি তো আর থাকতে পারি নে মা। বোললুম, না বাবা, তুমি আর থেকোনা, বাড়ি ফিরে যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না। বাবা বোললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি তো মা? বোললাম, আমার খবর নেবার তোমরা চেষ্টা কোরো না বাবা। আমার সতী-লক্ষ্মী মাকে বোলো যে, তার উষা মরেচে।

(চোখের জল মুছিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। এর পরই বুঝি এখানে চলে এলে?

কমল। না, হাতে টাকা ছিল। বাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গী জুটে গেল। তারা যাচ্ছিল বৃন্দাবনে, আমিও সঙ্গ নিলাম। তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছ তলায় কতদিন কেটে গেল। তারপর বড় গোঁসাইজীর কৃপায় এইখানে এসে আশ্রয় পেলুম।

শ্রীকান্ত। যাবার সময় তোমার এই জীবন-ইতিহাস আমার না শোনাই ছিল ভাল। যাক্, আমার সময় হোল, এই বেলা আমি বেরিয়ে পড়ি।

[শ্রীকান্ত আলনা হইতে নিজের গায়ের চাদরটী টানিয়া লইল]

শ্রীকান্ত। চল, বড় গোঁসাইজীর সঙ্গে একবার দেখা করে চলে যাই।

কমল। তাঁর সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না গোঁসাই। তিনি যে পূজা-পাঠে বসেছেন। আর একটু পরে গেলে হয় না ?

শ্রীকান্ত। না, এর পরে তো আর যাবার গাড়ী নেই।

কমল। তাহলে এসো। আবার আসবে তো নোতুন গোঁসাই ?

শ্রীকান্ত। তুমি থাকবে তো ?

কমল। তুমি বল কতদিন আমায় থাকতে হবে ?

শ্রীকান্ত। না, সে আমি তোমাকে বোলব না। (শ্রীকান্ত কমললতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল) আচ্ছা, আমি চললাম।

[শ্রীকান্ত চলিয়া গেল। কমললতা একদৃষ্টে তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজলক্ষ্মীর কলিকাতার বাড়ি। তখন রাত্রি আটটা—রাজলক্ষ্মী তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল]

রাজলক্ষ্মী। রতন! রতন!

[মহারাজ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল]

মহারাজ। রতন তো এখনো ফেরেনি মা।

লক্ষ্মী। ও, তোমার রান্না হয়ে গেছে ?

মহারাজ। না। রোজ দুবেলা ভাত-তরকারী ফেলা যাচ্ছে, তাই ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করে—

লক্ষ্মী। ফেলা যাচ্ছে বলে কি হবে। কখন আসবেন তা কি বলা যায়। যাও, রান্না চড়িয়ে দাওগে।

[মহারাজ চলিয়া গেল। অন্যদিক হইতে রাজলক্ষ্মীও চলিয়া যাইতে যাইবেন এমন সময় রতন প্রবেশ করিয়া ডাকিল]

রতন। মা।

লক্ষ্মী। কিরে, উনি ফিরেচেন?

রতন। না। এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে এলাম।

লক্ষ্মী। ওর বিছানা, জিনিষ-পত্তরগুলো নিয়ে এসেছিস্?

রতন। না। বাবু না বোললে বা চিঠি লিখে না দিলে তারা জিনিষ-পত্তর ছাড়তে চায় না। (সহসা শ্রীকান্তকে আসিতে দেখিয়া) এই যে বাবু এসে গিয়েছেন।

(শ্রীকান্তর প্রবেশের সঙ্গে রতনের প্রস্থান)

লক্ষ্মী। পুঁটুর বিয়ে হয়ে গেল?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। বিয়ে কেমন হোল?

শ্রীকান্ত। চোখে দেখিনি, তবে কানে শুনেছি, ভালই হোয়েছে।

লক্ষ্মী। চোখে দেখনি! তবে এতদিন ছিলে কোথায়?

শ্রীকান্ত। মুরারীপুরের বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

লক্ষ্মী। আছে বৈকি। বোষ্টমীরা ওখান থেকেই তো পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে কোরতে আসতো?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। সেইখানেই ছিলাম।

লক্ষ্মী। সেই বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা! বল কি গো? তাদের যে শুনেছি ভয়ঙ্কর ইল্লতে কাণ্ড। (হাসিয়া) তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আবার যে মূর্ত্তি তোমার দেখেছি। তা

কমল। তাঁর সঙ্গে কে [illegible] ঙ্ক পরা, বোষ্টমীরা কি বললে তোমায়? পূজা-পাঠে ক[illegible] (হাসিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। ও রকম হাসলে, এবার কিন্তু তোমায় ভয়ানক শাস্তি দোব। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার কোরতে পারবে না।

লক্ষ্মী। সে তোমার মত বীর-পুরুষের কাজ নয়। তুমি নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। তোমার মত ভীতু মানুষ সংসারে আর আছে নাকি?

শ্রীকান্ত। তুমি ভীতু বোলে অবজ্ঞা কোরলে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলেছিল আমাকে, আমি অহঙ্কারী, দাম্ভিক।

লক্ষ্মী। কেন? তার কি কোরেছিলে?

শ্রীকান্ত। কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নোতুন গোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার মত উদাসী-বৈরাগী মনের চেয়ে দাম্ভিক মন আর দুটি নেই।

লক্ষ্মী। তোমার উদাসী মনের খবর সে পেলো কি কোরে?

শ্রীকান্ত। তা জানি না।

লক্ষ্মী। বৈষ্ণবীর নামটা কি?

শ্রীকান্ত। কমললতা। কেউ কেউ রাগ কোরে কমলিলতাও বলে। কমললতার কীর্ত্তন গানে মানুষ সব ভুলে যায়।

লক্ষ্মী। তাই নাকি! কিন্তু তুমি কীর্ত্তন শুনতে এত ভালবাস, কই আমাকে তো সে কথা কোনাদিন বলনি?

শ্রীকান্ত। কেন বলব তোমাকে? গঙ্গামাটীতে একা একা সময় যখন আর কাটতে চাইত না তখন—

লক্ষ্মী। (মুখে হাত চাপা দিয়া) আর যদি বল, পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। কমললতার গান তুমি শুনেছ?

শ্রীকান্ত। শুনেছি। চমৎকার।

লক্ষ্মী। দেখতে কেমন?

শ্রীকান্ত। ভাল, অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক খাঁদা, উল্কিপরা যাদের তুমি দেখেছ, এ তাদের দলের নয়। এ ভদ্র ঘরের মেয়ে।

লক্ষ্মী। তা ভদ্র ঘরের মেয়ে বোষ্টমের আখড়ায় যে? নিশ্চয় পেছনে কিছু ইতিহাস আছে?

শ্রীকান্ত। আছে। অত্যন্ত করুণ ইতিহাস। আমার ইচ্ছে তার জীবন-ইতিহাস মুখে না বোলে, তোমাকে নিয়ে গিয়ে, তাকে একবার দেখাই। আগুনে পুড়ে পুড়ে সোনা কি করে খাঁটি হয়, তাকে না দেখলে, তার সঙ্গে না মিশলে ঠিক বোঝা যায় না।

লক্ষ্মী। বেশ ত! আমায় নিয়ে চল।

শ্রীকান্ত। তুমি যাবে?

লক্ষ্মী। যাব।

শ্রীকান্ত। বেশ! চল, কাল সকালের গাড়ীতেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। লক্ষ্মী, আমার পাঠশালার বন্ধু সেই গহরের কথা তোমার মনে আছে?

লক্ষ্মী। আছে বৈকি। তুমি তার মার কাছে গিয়ে চুপি চুপি খেয়ে আসতে।

শ্রীকান্ত। সেই গহরই আমায় কমললতার সন্ধান দিয়েছে।

লক্ষ্মী। বল কি! বোষ্টম-বোষ্টমীদের সন্ধান দিল গহরদাদা?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। মুরারীপুরের আখড়ায় তার খোঁজে গিয়েই তো, কমললতার সন্ধান পেলুম।

লক্ষ্মী। গহরদাদার সন্ধান কোরতে গেলে মুরারীপুরের আখড়ায়?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, মুরারীপুরের আখড়ায় সে রোজ যায়। দ্বারিকদাস বাবাজীর সঙ্গে সে ছড়া গান বাঁধে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, বলে গহর গোঁসাই।

লক্ষ্মী। বল কি গো? গহরদাকেও তারা গোঁসাই বানিয়েছে!

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে সে বাপ-পিতামহের ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করেনি। জান লক্ষ্মী, এই গহর যেদিন এক বিচিত্র সংসারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, কোন গভীর অরণ্যে যে আত্মগোপন কোরল, আসবার সময় তাকে আর খুঁজে পেলাম না। মনটা এই জন্যে আরো খারাপ হয়ে আছে।

লক্ষ্মী। বেশ তো, মুরারীপুরের আখড়ায় যাবার আগে, গহরদাদার সঙ্গে না হয় আমরা দেখা কোরে যাব।

শ্রীকান্ত। বেশ!

লক্ষ্মী। দেশে থেকে ঘুরে এসে, ভাবছি গঙ্গামাটী যাবো।

শ্রীকান্ত। গঙ্গামাটী যাবে! কেন?

লক্ষ্মী। জীবনের বাকি দিনকটা সেখানেই থাকবো ঠিক করেছি। আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি বর্মায় যাবে?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ।

লক্ষ্মী। বর্মায় গিয়ে কি কোরবে, চাকরী? কিন্তু আমরা তো দুজন, আমাদের প্রয়োজন কতটুকু?

শ্রীকান্ত। প্রয়োজন যত সামান্যই হোক, কিন্তু সেটুকুও তো চাই।

লক্ষ্মী। সেটুকু ভগবান দিয়ে দেবেন। শোন, আমি ঠিক করেছি গঙ্গামাটীর নিরক্ষর অসহায় মানুষগুলোর জন্যে আমার জীবনের যা কিছু সঞ্চয় আছে, তাই দিয়ে স্কুল, হাঁসপাতাল গড়ে তুলব। তুমি আর আনন্দ এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ কোরবে।

শ্রীকান্ত। কিন্তু তোমার এ-পরিকল্পনা বঙ্কু যদি সমর্থন না করে?

লক্ষ্মী। তাকে বঞ্চিত কোরে আমি আমার পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে যাচ্ছি না। তাদের যাকে যা দেবার সব দিয়ে, আমার

বোলতে আর যেটুকু আছে, তাই নিয়ে এবার আমি যাব স্থির কোরেছি।

[রাজলক্ষ্মীর পরিকল্পনার কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে]

চতুর্থ দৃশ্য

[মুরারীপুরের আখড়ার একটি ঘর। তখন সবে মাত্র ভোর হইতেছে। ফুলের সাজি হাতে লইয়া পদ্মা বাগানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সহসা রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিলে, বলে]

পদ্মা। স্থলপদ্ম তুলো না যেন লক্ষ্মীদি ?

রাজলক্ষ্মী। কেন ?

পদ্মা। কমললতাদি বারণ কোরে দিয়েছে।

লক্ষ্মী। তাই নাকি ! কেন ?

পদ্মা। কাল যখন বড় গোঁসাই ফুল তোলার ভার আমাদের ওপর দিলেন, তখন কমললতাদি চুপি চুপি আমার কানে কানে বোলে গেল স্থলপদ্ম তুলিসনি যেন। ওখান থেকে ও ফুল গোবিন্দ জীউকে নিবেদন করে দেওয়া হয়।

(রাজলক্ষ্মী স্থলপদ্মের ডাল ছাড়িয়া দিল)

লক্ষ্মী। ও ! কাল থেকে শুধু এই কথাই ভাবছি পদ্মা, কমললতাদিদি আখড়া ছেড়ে চলে গেলে, আমরা থাকব কি করে ?

পদ্মা। সত্যি। ওর জন্যে আমাদের কোন কিছু ভাবতে হোত না।

লক্ষ্মী। জানিনা, ঠাকুরের সেবায় কত ত্রুটী, কত ভুলই না আমরা কোরব। বড় গোঁসাইয়ের গুরু নবদ্বীপ থেকে এসে কমললতাদির হাত থেকে ঠাকুরের সেবার সব দায়িত্ব কেন যে কেড়ে নিলেন তা জানি না। ওর বড় সাধ ছিল, ঠাকুরের সেবা করতে করতে যেন দেহ রাখতে পারে। সেই ঠাকুরের সেবা থেকে যখন ও বঞ্চিত হয়েচে, তখন এখানে থাকবে আর কোন্ আশায় ?

পদ্মা। আমি দেখেছি লক্ষ্মীদি, কাল সারারাত ওর চোখের কোল বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়েছে। দেখে বোললাম, তুমি ঘুমোওনি কমলদি ? কাঁদছ ? বোললে না, ঠাকুরের নাম করছি।

পদ্মা। ওর ঐ ঠাকুরের নাম করা যেন সার্থক হয় পদ্মা। ওর চোখের জল যেন গোবিন্দ জীউর চরণে ছোঁয়া লাগে।

[সহসা কমললতা পিছন হইতে আসিয়া বলিল]

কমললতা। দূর পোড়ার মুখী, গোবিন্দ জীউর চরণ ছোঁয়া কি মুখের কথা ? কিন্তু আক্ষেপ করেই তো সময় কাটালি। ফুল তুলতে যাবি কখন ? মঙ্গল আরতির যে সময় হোয়ে এল। যা, যা, তাড়াতাড়ি যা।

পদ্মা। কমলদি, কাল সন্ধ্যায় তুমি কীর্ত্তনের আসবে বসনি, নাম করনি। এখন একটা নাম করনা ভাই, শুনি।

কমল। নাম শুনে তোরা কমললতার দুঃখ ভুলতে চাস্, কমললতাকে ভোলাতে চাস্, কেমন ? বল্, সত্যি বোলেচি কিনা ?

(পদ্মা ও রাজলক্ষ্মী মাথানত করিল—সহসা মঙ্গল আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)

ওরে, যা যা, শিগ্গীর যা, আর দেরী করিসনে।

[রাজলক্ষ্মী ও পদ্মা ব্যস্তভাবে যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল]

লক্ষ্মী। তুমি যাবে না কমলদি ?

কমল। (কাঁদিয়া) না রে না, আজ আর আমি যাব না। তাঁর সেবার অপরাধ করেছি বলেই তিনি যে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। তোরা যা ভাই, তোরা যা।

(কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল—পদ্মা ও রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

[গহরের বাটীর সদর দরজার সম্মুখ। তখন অপরাহ্নকাল, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী দরজায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

রাজলক্ষ্মী। এইটেই গহরদাদের বাড়ি, না?

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি ভেবেছিলাম, বহুকাল পরে হয়তো তুমি চিনতে পারবে না।

লক্ষ্মী। দেশ ছাড়া অনেকদিন সত্যি। কিন্তু এদেশেই তো মানুষ হোয়েছি। গহরদাকে ডাক।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, এই যে ডাকি। গহর! গহর!

[শ্রীকান্ত কড়া নাড়িল। নবীন দরজা খুলিয়া বাহির হইল। তার মুখে কথা নেই। শুধু ঠোঁটদুটী নড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকান্ত বলিল]

শ্রীকান্ত। কি ব্যাপার কি নবীন?

নবীন। আর দুটো দিন আগেও যদি আসতেন বাবু!

(কাঁদিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। কেন? কি ব্যাপার নবীন?

নবীন। পরশু রাত্রে দাদাবাবু আমায় ছেড়ে চলে গ্যাছেন।

শ্রীকান্ত। সে কি! গহর নেই?

নবীন। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

শ্রীকান্ত। কি হয়েছিল?

নবীন। সেদিন সেহ আখড়া থেকে বেরিয়ে পথের মাঝে তার মামাত ছোট বোনের অসুখ শুনে সুনাম গাঁয়ে গিয়েছিলেন তাকে দেখতে, সেখান থেকে নিজে অসুখ নিয়ে ফিরে এলেন। সে অসুখ আর সারলো না বাবু।

(গামছায় চোখ মুছিতে লাগিল)

শ্রীকান্ত। চিকিৎসা হয়েছিল?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

শ্রীকান্ত। আখড়ায় ওঁরা এ খবর জানেন?

নবীন। জানেন বৈকি।

শ্রীকান্ত। বড় গোঁসাইজী গহরকে দেখতে আসতেন?

নবীন। হ্যাঁ, তবে নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরু এলে শেষের কদিন আর আসতে পারেন নি।

শ্রীকান্ত। ওখান থেকে আর কেউ আসতো না নবীন?

নবীন। হ্যাঁ। কমললতা রোজ আসতেন। শেষের তিনদিন খাননি, শোননি, দাদাবাবুর কি সেবাটাই না করেছেন! চলুন বাবু, বসবেন চলুন।

শ্রীকান্ত। না নবীন, ও ঘরে আর আমি যেতে পারব না।

নবীন। তাহলে একটু দাঁড়ান। আপনাকে দেওয়ার জন্যে একটা জিনিস তিনি রেখে গেছেন, নিয়ে আসি।

(ব্যস্তভাবে ভিতরে চলিয়া গেল)

লক্ষ্মী। চল, এখান থেকেই আমরা ফিরে যাই। গহরদাদার মৃত্যুর খবর শুনে মনটা ভারি হয়ে উঠল, মুরারীপুরের আখড়ায় গিয়ে আর কাজ নেই।

[ইতিমধ্যে নবীন একটি টিনের বাক্স লইয়া আসিল এবং সেটা শ্রীকান্তর হাতে দিয়া বলিল]

নবীন। এটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।

শ্রীকান্ত। কি আছে এতে ?

নবীন। খুলে দেখুন।

[শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বাক্সটা দিয়া বলিল]

শ্রীকান্ত। দ্যাখো তো লক্ষ্মী।

[রাজলক্ষ্মী বাক্সটা খুলিয়া বলিল]

লক্ষ্মী। কবিতা লেখা কতকগুলি খাতা আর একতাড়া নোট। এই যে, তোমার নামে একটা চিঠিও রয়েছে।

শ্রীকান্ত। লক্ষ্মী, এ কবিতার খাতার দিকে চেয়ে চোখ আমার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, তুমি পড় লক্ষ্মী, আমি শুনি।

[রাজলক্ষ্মী চিঠি পড়িতে লাগিল]

লক্ষ্মী। রামায়ণ শেষ করার সময় হোল না। বড় গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন—নষ্ট না হয়। নবীনের হাতে বাক্সটী

রেখে গেলাম, তুমি নিও। টাকাগুলো তোমার হাতে দিলাম, কমললতার যদি কাজে লাগে তাকে দিও। সে না নিলে যা ইচ্ছে হয় কোরো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—গহর।

শ্রীকান্ত। দেখেছ লক্ষ্মী, দেখেছ, এ-দানের মধ্যে এতটুকু গর্ব্ব নেই। এতটুকু কাকুতি মিনতিও নেই। সে কবি। মুসলমান ফকীর বংশের রক্ত তার শিরায়, তাই শান্ত মনে, সে তার হতভাগ্য এই বাল্যবন্ধুর উদ্দেশ্যে শুধু এইটুকু লিখে রেখে গেছে।

লক্ষ্মী। এখান থেকেই ফিরে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু গহরদাদা যখন এতবড় দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়ে গেছেন, তখন সে দায়িত্ব পালন না করে তো ফিরে যাওযা চলে না।

শ্রীকান্ত। হ্যাঁ, চল লক্ষ্মী—আখড়াতেই যাই।

নবীন। চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

শ্রীকান্ত। না নবীন, তার দরকার নেই। তুমি ঘরে যাও।

নবীন। ও-ঘরে কি আর থাকতে পারছি বাবু? ঘর-দোরগুলো যেন খাঁ-খাঁ করে খেতে আসছে। বাড়ির মানুষ বাড়িতে একদণ্ডও থাকতো না। কিন্তু বাড়ির মানুষ আছে জেনেই ঘরগুলো তখন ভর্ত্তি হয়ে থাকত। বিষয়-সম্পত্তি মামাতো ভাই-বোনেদের দিয়ে গেছেন। তাঁরা এসে সব ভার নিয়ে আমায় ছুটী দিলেই এবার আমি বাঁচি বাবু।

[নবীন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[মুরারীপুরের আখড়া। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। আখড়ার দাওয়ায় কীর্ত্তনের আসর বসিয়াছে। আজ সরস্বতী গাহিতেছিল। গানের মাঝে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। গহরের বাক্সটী রাজলক্ষ্মীর হাতে]

[সরস্বতীর গান]

"আমি ভালবেসে কেঁদে মরি
আহা! তুমি ত জাননা হরি!
দুখ দাও নাম দুখহারী
যদি নাম ধর সখা,
দুঃখহারী শ্যাম
বুক ভরে কেন দুঃখ দাও—
তোমার বিরহ দহন দানে,
প্রেম-ধূপ জলে প্রাণে।
এত জ্বালা আর সহিতে কি পারি
তুমি ত জান না হরি॥"

[গীতান্তে দ্বারিকদাস শ্রীকান্তকে বলিলেন]

দ্বারিকদাস। সব শুনেই আসছো বোধ হয়?

শ্রীকান্ত। শুনে আসিনি। এসে শুনলুম। গেলাম গহরের সঙ্গে দেখা করতে, কাঁদতে কাঁদতে নবীন এসে সব কথা জানালে।

দ্বারিকদাস। আহা! নবীনের খুবই কষ্ট হয়েছে গোঁসাই। (রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া) বসো দিদি, বসো। গোঁসাইয়ের সঙ্গে দেখেই বুঝেছি, তুমি আমাদের আত্মজন। সংসারের হাটে আমাদের নোতুন করে চেনা পরিচয়ের প্রয়োজন হয়না দিদি।

[রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত বসিল। দ্বারিকদাস জিজ্ঞাসা করিলেন]

দ্বারিক। তোমার হাতে ওটা কি দিদি?

রাজলক্ষ্মী। গহর দাদার দান।

দ্বারিক। কি আছে ওতে?

[শ্রীকান্ত বাক্স হইতে পাণ্ডুলিপি লইয়া]

শ্রীকান্ত। গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলো মঠে থাকে।

দ্বারিক। (হাত বাড়াইয়া রামায়ণের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিয়া) তাই হবে নোতুন গোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটা তুলে রাখব।

লক্ষ্মী। আমরা এলাম বলে, কীর্ত্তন বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

দ্বারিক। ওর জন্যে কিন্তু হওয়ার কিছু নেই দিদি। কীর্ত্তন যে আনন্দ, তোমাদের আসার মাঝে আমরা সেই আনন্দই পাচ্ছি।

লক্ষ্মী। তা হলে আজ আর কীর্ত্তন হবে না?

দ্বারিক। হবে না কেন? তোমরা ঠাকুরের কাছে ইচ্ছে কোরলেই নিবেদন করতে পার।

লক্ষ্মী। ঠাকুরের কাছে নিবেদন করার আমার অধিকার আছে?

দ্বারিক। আছে বৈকি দিদি। এ অধিকার সকলেরই আছে।

শ্রীকান্ত। গহরের দুঃখের ভার লাঘব করতে তুমি কি কীর্ত্তন গাইবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। গাইব।

দ্বারিক। (খোলটার প্রতি আঙ্গুলী নিদ্দেশ করিয়া) ওটায় কোন বাধা জন্মোবে না তো ?

লক্ষ্মী। না।

[খোল করতাল সহযোগে কীর্তন সুরু হইল, রাজলক্ষ্মী গাহিতে লাগিল]

[রাজলক্ষ্মীর গান]

"একে পদ পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর-জর ভেল,
তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানলুঁ চিরদুখ অবধরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ানু গৃহ-সুখ আশ,
পন্থক দুখ তৃণ হুঁ করি না গণলুঁ কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥"

[গানের মাঝে এক পাশে ধীরে ধীরে কমললতা আসিয়া প্রবেশ করিল। গানেব সুরে সে আত্মহারা। অশ্রুধারায় দুই গণ্ড বহিয়া যাইতেছে। গীতান্তে দ্বারিকদাস ঘরের ভেতর প্রবেশ করিলেন। শ্রীকান্ত অদূরে কমললতাকে দেখিয়া—]

শ্রীকান্ত। ওকি কমল, দাঁড়িয়ে কেন ? লক্ষ্মী যে তোমার সঙ্গে পরিচয় কোরতে এসেছে।

[কমললতা ধীরে ধীরে নিকটে আসে]

শ্রীকান্ত। একি দিদি ! তোমার চোখে জল কেন ?

[অপ্রতিভভাবে চোখের জল মুছিয়া কমললতা রাজলক্ষ্মীকে বলিল]

কমললতা। প্রথম পরিচয়ে কি এমন ভাবে কাঁদতে হয় দিদি ? "একে পদ পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত—কণ্টকে জর জর ভেল"। সত্যিই তাই, এসো গোঁসাই, আমার ঘরে এসো।

[ইতিমধ্যে দ্বারিকদাস বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা লইয়া আসিলেন। রাজলক্ষ্মী তখন শ্রীকান্ত ও কমললতার সহিত চলিয়া গিয়াছে]

(মঞ্চ ঘুরিয়া গেল)

[কমললতার ঘর। কমললতার সহিত রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত প্রবেশ করিল]

শ্রীকান্ত। নবীনের কাছে শুনেছিলাম, প্রাণপাত করে তুমি গহরের সেবা করেছ।

কমল। কিন্তু সে আর সার্থক হোল কৈ ?

লক্ষ্মী। তার জন্যে আক্ষেপ করে তো লাভ নেই ভাই।

[পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা। বড় গোঁসাই আপনাকে ঠাকুরের প্রসাদী মালা দেবেন বলে ডাকছেন।

লক্ষ্মী। আমাকে ?

পদ্মা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

(রাজলক্ষ্মী পদ্মার সহিত চলিয়া গেল)

কমল। এই বেলা তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। (প্রণাম করিল—ও উঠিয়া) আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও।

শ্রীকান্ত। কি বলছ কমল? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা। কি হয়েছে?

কমল। একটু আগে তুমি বলছিলে গোঁসাই, গহর গোসাইয়ের আমি প্রাণপাত করে সেবা করেছি। (রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ) কিন্তু সেই সেবার কি পুরস্কার পেয়েছি জান!

শ্রীকান্ত। কৈ? না ত।

কমল। আজ আমার মনে হচ্ছে, গহর গোসাইকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম, তা হ'লে আজ আমার পক্ষে তবু একজন বলার লোক থাকতো, যে আমি অশুচি মন নিয়ে গহর গোসাইয়ের সেবা করিনি।

শ্রীকান্ত। তুমি অশুচি! এ কথা কে বোললে?

কমল। বড় গোঁসাইজীর গুরুদেব আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা নবদ্বীপ থেকে এসেছিলেন, তাঁরা বলে গেছেন।

শ্রীকান্ত। কি বলে গেছেন তাঁরা?

কমল। আমি অশুচি। আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হবেন। তাই ঠাকুর ঘরে যাওয়া আমার নিষেধ, ফুল তোলা আমার নিষেধ। তাই কীর্ত্তনের আনন্দ আজ আমি দুর থেকে উপভোগ করি।

শ্রীকান্ত। এ সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

কমল। হ্যাঁ। (ঘাড় নাড়িয়া)

শ্রীকান্ত। এ মিথ্যে। এ অসম্ভব।

[সহসা দ্বারিকদাস প্রবেশ করিয়া বলিলেন]

দ্বারিক। এ কখনও হতে পারে না। শুনছি, কমল বৃন্দাবনে চলে যাবে। আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষকে দূর করে যদি নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম। মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

শ্রীকান্ত। তাই যখন বুঝেছ গোঁসাই, তবে তাকেই বা যেতে দেবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কেন? মঠের কর্তা ত তুমি?

দ্বারিক। ঠিকই বলেছ গোসাই। মঠের কর্তা আমি। কিন্তু তিনি গুরু-গুরু-গুরু।

(প্রস্থান)

শ্রীকান্ত। বুঝলাম বড় গোঁসাইয়ের গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করার উপায় নেই।

কমল। সত্যিই তাই।

লক্ষ্মী। কিন্তু মানুষের সমাজে মৃত্যু-পথ-যাত্রী বন্ধুর সেবার কি এই পুরস্কার?

কমল। হ্যাঁ। আর দেরী কোরব না। এই পুরস্কার মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

শ্রীকান্ত। (নোটের তাড়া দেখাইয়া) গহর এই টাকাগুলো তোমায় দিতে বলে গেছে।

কমল। আমি ভিখিরী। টাকা নিয়ে কি কোরব?

শ্রীকান্ত। তবু যদি কখনো কাজে লাগে?

কমল। আমারও একদিন অনেক টাকা ছিল, কি কাজে লাগল!

ওগুলো রেখে দাও। যদি কখন দরকার হয়, তোমার কাছে চেয়ে নেব।

শ্রীকান্ত। সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চললে?

লক্ষ্মী। বড় আশা করে এসেছিলুম তোমার সঙ্গে পরিচয় কোরব বলে। কিন্তু যে পরিচয় নিয়ে গেলুম, জীবনের পাতায় এ পরিচয় চিরদিনই চোখের জলে লেখা থাকবে।

কমল। কি গানটা যেন গাইছিলে দিদি? যাবার সময় গানটা আর একবার গাওনা ভাই—

"একপদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।"

[গানটা গাহিতে গাহিতে কমললতাসহ সকলে ঘরের বাহির হইয়া গেল]

(মঞ্চ ঘুরিয়া গেল)

[আখড়ার বহির্ভাগ। দেখা গেল দ্বারিকদাস বাবাজী এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। কমললতা ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে আসিল, গোবিন্দ-জীউকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তখন মন্দির চত্বরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী গাহিতেছে, পার্শ্বে শ্রীকান্ত। সকলের চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে]

যবনিকা